জলরেখা

বিমল কর

পরিবেশক
কারেণ্ট বুক সপ
৫৭এ, কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশিকা
মঞ্জুশ্রী মজুমদার
৭নং রামহরি ঘোষ লেন
কলিকাতা-

মুদ্রাকর
শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫।৭, কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট
সুবোধ দাসগুপ্ত

ব্লক
রনজিত প্রশেস এণ্ড প্রিন্টিং ইণ্ডাষ্ট্রিজ
২৬-এইচ সিমলা রোড, কলি—৬

দাম: ২·৫০

জ ল রে খা

সূচীপত্র

প্রবোধ, সুবোধ, অজয়

স্নেহাস্পদেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

দেওয়াল

পিঙ্গলার প্রেম

আঙরলতা

ফানুসের আয়ু (যন্ত্রস্থ)

বিষলতা

ঘরবাড়ি ছোট; কিন্তু আয়োজনটা ছোট নয়। সোয়া দু'শ টাকার কেরানী ছেলের পক্ষে ঘটাটা একটু বড়ই। মৃগাঙ্ক আগেই বারণ করেছিল, বেশী ঝামেলা করো না বৌদি; লোকজন নেই, জায়গা বলতে তো দুটো ঘর, একটু বারান্দা। ভীষণ মুশকিলে পড়বে। কথাটা যমুনা কানে তোলে নি। ছেলের অন্নপ্রাশনের আয়োজনটা একটু বাড়াবাড়ি রকমেরই করে ফেলেছে। আর ছেলের মা-বাবার চেয়ে কাকাকেই নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছিল বেশি। এ-নিয়ে একটা কেলেংকারীও হতে যাচ্ছিল আর কি!

ছোট বাড়িটা ভিড় গিজগিজে। লোকজন আসছে। হৈ-হট্টগোল। বারান্দার একপাশে রান্না চেপেছে; আর একপাশে কলাপাতা আর মাটির খুরি-গেলাস। তারই মধ্যে মেয়েদের আসি-যাই ছাড়ুন-সরুন; শাঁখ-কই, দুর্বো-কই। একদঙ্গল অপগণ্ডর ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি। মৃগাঙ্কর ঘরটায় দাদার শ্বশুর বাড়ির সম্পর্কের ইনি-উনি এবং বহুজন। বৌদির ঘরে মেয়েদের আসর। আর রান্নার তদারকি থেকে শুরু করে মানুষজনের আপ্যায়ন সবটাই মৃগাঙ্কর কাঁধে চেপেছে। হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল মৃগাঙ্ক। যমুনার ওপর চটছিল মনে মনে।

এমন সময় চোখ পড়ল। উঠোনটায় দাঁড়িয়ে দরজার দিকে তাকাতেই খোলা সদরের চৌকাটের ওপর আর একজনকে দেখা গেল। একটি মেয়ে। সসংকোচ ভঙ্গি।

কাছে এগিয়ে যেতেই মেয়েটিকে চিনতে পারল মৃগাঙ্ক। সে-চেনা খুশী হওয়ার মতন নয়; আপ্যায়ন করার মতনও নয়। বিস্মিত হবার মতন।

মুখে প্রশ্নটা সরাসরি করতে না পারলেও মৃগাঙ্ক যে-ভাবে তাকাল, তার অর্থ: কি চাই আপনার, কাকে চাই?

মৃগাঙ্কর মুখের দিকে একটু চেয়ে মেয়েটি বললে, 'রানীদির এই বাড়ি ?'

রানীদি ! মৃগাঙ্ক নামটা কিংবা মানুষটাকে মনে করতে পারল না। মাথা নাড়ল। না, রানীদির বাড়ি এ-নয়।

মেয়েটি বোধ হয় অপ্রস্তুতে পড়ল। কি করে কথটা বলবে বুঝতে পারল না শেষে বলল, 'চিঠিটা আমি হারিয়ে ফেলেছি, নম্বরটা পর্যন্ত মনে নেই ঠিক ; উনিশের এক না উনিশের একের বি—ঠিক মনে করতেও পারছি না। রানীদির ছেলের অন্নপ্রাশন।

মৃগাঙ্ক এতক্ষণ প্রায় পথ আটকে ছিল। এবার রাস্তা দিয়ে বলল, 'রানীদি বলে ঐ-বাড়িতে কেউ থাকে না ; তবে একটা অন্নপ্রাশনের আয়োজন আছে এ বাড়িতে। আপনি ভেতরে গিয়ে দেখুন যদি চিনতে পারেন।'

এরপর পা বাড়ান যায়না। মেয়েটি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

মৃগাঙ্ক হঠাৎ বলল, 'আপনি ভেতরে আসুন, আমি বৌদিকে ডেকে দিচ্ছি।'

মেয়ের দঙ্গল থেকে যমুনাকে বের করে আনা কি সহজ ! আর এল যখন, সদরে দাঁড়ান মেয়েটিকে দেখে দিশেহারা হয়ে গেল। 'ওমা, তুই সত্যই এসেছিস নবদুর্গা ! আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। ইস্ কত বড় হয়ে গেছিস রে তুই ! তা সদরে দাঁড়িয়ে কেন ? ছি ছি ছি, ঠাকুরপোর কাণ্ডই ওই। তা তোর কর্তাটিকে নিয়ে এলি না কেন রে ?' মেয়েটির হাত ধরে টানতে টানতে যমুনা উঠোন পেরিয়ে গেল, 'মানুদির বাড়িতে গিয়েছিলাম নেমন্তন্ন করতে—সেখানে তোদের কথা শুনলাম, ঠিকানা পেলাম। সত্যিরে, আমি তো ভাবতেই পারি নি তুই আসবি !'

মৃগাঙ্ক এই নবদুর্গাকে বুঝতে পারল না। রানীদি যে কোন মন্ত্রবলে যমুনা হয়ে গেল তাও মৃগাঙ্কর বোধগম্য হল না।

এই নবদুর্গাকে বুঝুক না বুঝুক কদিন আগেকার কথাটাই ভাবছিল মৃগাঙ্ক।

দিন পনেরো আগে হবে বড় জোর। মৃগাঙ্ক ভবানীপুর থেকে ফেরার সময় এই মেয়েটিকে প্রথম দেখেছিল। বাদলা সন্ধ্যে। রাত প্রায় আটটা বাজে-বাজে। চৌরঙ্গি দিয়ে বাসটা আসছিল। মাঠের অন্ধকার থেকে যেন হঠাৎ এই মেয়েটি এসে বাসে উঠল। মৃগাঙ্কর সামনেই বসেছিল। পরিবেশ এবং চেহারা দুই-ই মেয়েটিকে খুঁটিয়ে দেখতে উৎসাহ জাগিয়েছিল। শ্যামল রং, দোহারা গড়ন গোল মুখ, সাজ-সজ্জায় সচ্ছলতার পরিচয় তেমন না থাক, মোটামুটি শোভা ছিল। হাতে লেডিস ছাতা, লেডিস ওয়াটারপ্রুফ। হয়ত এই মেয়েটিকে একবার দেখে ভুলে যাওয়া সম্ভব হত মৃগাঙ্কর যদি না তার পরের ঘটনাগুলো ঘটতো। মেয়েটিকে সঙ্গ দিচ্ছিল এক ছোকরা। সেটা প্রথমে দেখা যায় নি; পরে বোঝা গেল। মেয়েটি উঠল সামনের দরজা দিয়ে। বসল সামনেই। ছেলেটি পিছন দরজা দিয়ে উঠে এল। বসল মেয়েটির সীটেই। কিন্তু অনেকখানি তফাৎ রেখে। দুজনের টিকিট কাটল ছোকরা। কিন্তু আশ্চর্য, সারটা পথ কেউ কারুর সঙ্গে কথা বললে না। ওয়েলিংটনের মোড় ছাড়িয়ে আসতে মেয়েটি নেমে গেল। নামার আগে সঙ্গীর দিকে চেয়ে একটা বিদায়-হাসি।

মৃগাঙ্ক আগাগোড়া ব্যাপারটা দেখে গেল। ব্যাপারটা বুঝল না। যেটুকু অনুমান করল তাতে খুশী হওয়া যায় না।

মৃগাঙ্ক জানত না, আবার মেয়েটির সঙ্গে দিন দুয়েকের মধ্যেই দেখা হয়ে যাবে। অথচ হল। এবার বাসে নয়—বউবাজারের এক চায়ের দোকানে। চা খেতে ঢুকেছিল মৃগাঙ্ক। চোখে পড়ল—কাঠের ফালি-কুঠরির মধ্যে সেই মেয়েটি। এবার অন্য এক সঙ্গী। ওমলেট টোস্টের সঙ্গে যত কথা তত হাসি।

প্রথম দিনে মৃগাঙ্ক অশোভন কিছু একটা অনুমান করেছিল, দ্বিতীয় দিনে সন্দিহান হল। এবং দিন পাঁচ সাত পরে আবার যখন চৌরঙ্গির মোড়ে মেয়েটিকে অন্য মানুষের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে গল্পে বিভোর হয়ে চলে যেতে দেখা গেল—মৃগাঙ্ক তার ধারণাটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়ে গেল।

কিন্তু কে আশা করেছিল এই মেয়েটিকে এবার আর পথেঘাটে নয় নিজের বাড়ির সদরে, সদরেই বা কেন অন্দরে দেখা যাবে !

ঘণ্টা খানেকেরও বেশি থাকল মেয়েটি। তারপর চলে গেল। যাবার আগে মৃগাঙ্কর দিকে চেয়ে একটু হেসেছিল। হাসিটা এমন, যেন মনে হয় নবদুর্গা বলছিল, আপনি তো আমায় সদর থেকেই তাড়াচ্ছিলেন। কিন্তু দেখলেন তো এ বাড়িতে রানীদি আছে—আর আমি এখানে সেই সুবাদে আসতে-যেতে পারি।

রাত্রে সব কিছু শান্ত হলে যমুনাকে কথাটা জিজ্ঞেস করল মৃগাঙ্ক, 'ওই মেয়েটি কে বৌদি ?'

'ওমা, ও যে আমার বোন হয় ?'

'বোন !' মৃগাঙ্ক অবাক। 'কই আগে তো দেখিনি, নামও শুনিনি। তুমিই বা বাপু রানীদি হলে কবে থেকে ?'

'সবই কি তোমাদের শুনতে হবে ! বিয়ের তো ঠিকুজী কুষ্ঠি মেলাতে কিছু আর বাকি রাখ নি, আবার কেন ?' যমুনা হাসল। বলল তারপর, 'আমার ছেলেবেলার ডাক নাম রানী। নবদুর্গা আমার মা-র খুড়তুতো বোনের মেয়ে। খুব ছেলেবেলায় একসঙ্গে থেকেছি একবার, কিছুদিন ; দেশের বাড়িতে। ও আমার চেয়ে ছোট। বছর দু-তিনের তো বটেই। বড় হয়ে আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। আমরা থাকতাম বর্ধমানে ওরা কলকাতায়। তারপর কোথায় কে গেল, কার বিয়ে হল, কে মরল। ইচ্ছে থাকলেও কি আর খোঁজ নেবার উপায় আছে, ভাই। নবদুর্গার খবর আমি জানতাম না। সে-দিন মানুদিকে নেমন্তন্ন করতে গিয়ে ওর কথা শুনলাম। ওর মা মারা গেছে অনেকদিন, বাবাও মরেছে বেশ কিছুকাল। বড্ড কষ্টে কেটেছে ওদের। বেচারীকে কতো কাল দেখি নি। কাছেই আছে। তাই চিঠি লিখেছিলাম।' একটু থামল যমুনা। কি যেন ভাবছিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আচমকা বলল 'ওর স্বামী অন্ধ।'

অন্ধ ! মৃগাঙ্ক কেমন একটু চমকে গেল।

যমুনা আর কিছু বলল না।

এ রকম হয়। কোনো কোনো মানুষ সম্পর্কে একটা আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে। কেন হয় বলা কঠিন। হয়ত আকর্ষণ, হয়ত কৌতুহল, হয়ত সহানুভূতি।

নবতুর্গা সম্পর্কে মৃগাঙ্কর আগ্রহও স্বাভাবিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। ভীষণ একটা কৌতুহল বোধ করতে শুরু করেছিল মৃগাঙ্ক। সুশ্রী, অল্প বয়সের মেয়ে, স্বামী আছে, এবং অন্ধ স্বামী—আর এই মেয়েটি পথে পথে ছোকরা বয়সী ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, চা খায়, হাসি গল্প করে। কেন? নবতুর্গা কেমন মেয়ে? ভাল না মন্দ? ভাল বলে মনে করতে পারলে ভালই হত, কিন্তু তা যে মনে করা যায় না। নবতুর্গা যে মন্দ—একথাই বা জোর করে বলা যায় কি করে!

মৃগাঙ্ক ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চাইল কয়েকবার। কিন্তু পারল না। এবং একদিন কিসের এক অদ্ভুত টানে নবতুর্গার বাড়ি গিয়ে হাজির হল।

যমুনার কাছ থেকে বাড়ির ঠিকানাটা যোগাড় করেই নিয়েছিল মৃগাঙ্ক। তারপর অফিস-ছুটির পর খানিক ঘুরে ফিরে সন্ধ্যের দিকে নবতুর্গার বাড়ি।

গলিটা ছোট। তেমনি নোংরা। ঠিকানা মতন বাড়িটাও বাসযোগ্য নয়। মৃগাঙ্ক ভাবছিল কি করবে। কড়া নাড়বে কি না, ডাকবে কি ডাকবে না। এমন সময় দেখা। নবতুর্গা আসছিল। বাড়ির সামনেই মুখোমুখি।

চিনতে পারল নবতুর্গা। আবাক হল আরো বেশি। 'আপনি—?'

মৃগাঙ্ক থতমত খেয়ে গেল প্রথমটা। তারপর সামলে নিয়ে বলল, 'এই পথেই এসেছিলুম—হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়ল। বৌদি একবার খোঁজ নিতে বলেছিল। ভাবছিলুম দেখা করে যাই।'

নবতুর্গার মুখে একটু হাসির ছোঁয়া লাগল। একটু অন্যমনস্ক। বলল, 'সময় মত এসে পড়েছি। না হলে কিন্তু মুশকিলে পড়তেন।'

'কেন?'

'বাড়িতে আমার যিনি আছেন, তিনি অন্ধ। সংসারের কোনো খোঁজই রাখেন না। পরিচয় দিলেও বুঝতে পারতেন না, আপনি

কে!' নবদুর্গার মুখে ম্লান একটু হাসি ফুটল আবার। গ্যাসের বাতিটা সবে তখন জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেই আলোয় মৃগাঙ্ক এই হাসির মধ্যে যেন নতুন কিছু দেখল।

'আসুন।' নবদুর্গা বলল।

হঠাৎ কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করল মৃগাঙ্ক। বলল, 'থাক; দেখা তো হয়েই গেল, বৌদিকে গিয়ে বলব।' একটু থেমে আবার, 'এইমাত্র ফিরলেন আপনি; এখন—!'

'না, না—সে কি! বাড়িতে এসে দরজা থেকে চলে যাবেন। আসুন ভেতরে আসুন।'

নবদুর্গার সঙ্গে মৃগাঙ্ক ভেতরে এল। একটি ঘর; একটু বারান্দা। তারই একটা পাশ ছেঁড়া চট দিয়ে ঢাকা! রান্নাঘর বোধ হয়। সমস্ত জায়গাটা ভীষণ ঠাণ্ডা। অন্ধকার। পাশের বাড়ির এক ঝলক আলো যা উঠোনটায় আছে।

পায়ের শব্দে ভেতর থেকে একজন কথা বললে, 'মায়া নাকি?'

'হ্যাঁ।' জবাব দিল নবদুর্গা। জুতোটা খুলতে খুলতে বলল, 'আমার স্বামী।'

এই আবহাওয়া, অন্ধকার, নবদুর্গা, নবদুর্গার স্বামী—সব যেন কেমন লাগছিল মৃগাঙ্কর।

লণ্ঠন জ্বালাতে জ্বালাতে নবদুর্গা বললে, 'একটু দাঁড়ান। বাতি না জ্বাললে বসার আসনও দিতে পারব না।'

ঘরের মধ্যে থেকে নবদুর্গার স্বামীর কথা শোনা গেল, 'কে এসেছে, অনাদিবাবু নাকি?'

'না।' মায়া জবাব দিল, 'মৃগাঙ্কবাবু। রানীদির দেওর।'

'কে রানীদি?' ওপাশের গলা একটু অন্যরকম।

'আমার মাসতুতো বোন। সেই যে যার ছেলের অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্নে—'

'ও!' ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন।

মৃগাঙ্ককে ঘরে বসিয়ে মায়া বাইরে চলে গেল। লণ্ঠনের আলোয় মৃগাঙ্ক দেখল ভদ্রলোককে। বয়স হয়েছে। সমস্ত মুখে তার ছাপ। বসন্তের দাগে মুখটি ভয়াবহ। খুব সম্ভব চোখ ছুটিও তাতে গেছে।

কতকগুলো সাধারণ কথাবার্তা হল। কোথায় থাকেন, কি করেন ইত্যাদি।

মায়া তুকাপ চা নিয়ে এল। তুটো মিষ্টিও। মৃগাঙ্ক না না করলেও শেষ পর্যন্ত একটা মিষ্টি মুখে না তুলে পারল না।

চা শেষ করে মৃগাঙ্ক উঠি উঠি করছে, মায়ার স্বামী বললে, 'বাজনাটা দাও।'

কোণে রাখা সেতারটা খোলস খুলে এগিয়ে দিল মায়া। কয়েকটা টুং টাং শব্দ। শুনে মনে হল ভদ্রলোক সুর বাঁধতে বসলেন।

ঘর থেকে বাইরে এসে মৃগাঙ্ক শুধলো, 'উনি বুঝি সেতার বাজান?'

'হ্যাঁ; করার মধ্যে শুধু ওই একটি কাজই করেন। সেতার বাজান।' মায়ার গলার স্বরটা খুব মধুর নয়, কেমন কেমন যেন ক্ষুব্ধ, ঈষৎ কঠিন।

মৃগাঙ্ক জুতোটায় পা দিচ্ছে—এমন সময় ভেতর থেকে আবার গলা শোনা গেল, 'আমার ওষুধটা দিয়ে যাও।'

মায়া শুনল। সাড়া দিল। 'আসচি'।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিল মায়া। মৃগাঙ্কর কি কৌতূহল হল। শুধলো, 'আপনি কি সন্ধ্যে করেই বাড়ী আসেন?'

'বেশির ভাগ দিন তাই। চাকরি শেষ করে টিউশনিতে যাই। তারপর বাড়ি ফিরি।'

'আপনার কোন অফিস?'

'অফিস নয়, দোকান। চৌরঙ্গির এক ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোর।' নাম আর ঠিকানাটাও বললে মায়া।

মৃগাঙ্ক দরজাটা খুলে পা বাড়াচ্ছিল, এমন সময় আবার শুনল, ভেতর থেকে রুক্ষ গলায় ভদ্রলোক হাঁক পাড়লেন, 'কই কি হল—

আমার একরত্তি আফিং—তার জন্যে কি শাহাজাদীর পা ধরতে হবে নাকি ?'

অন্ধকারেই মৃগাঙ্ক আর একবার চমকে উঠল। মায়ার মুখটা দেখবার চেষ্টা করল, কিন্তু অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করা গেল না।

খুব আস্তে গলায় মায়া শুধু বলল, 'রানীদিকে বলবেন, আমি ভাল আছি।'

মৃগাঙ্কর মনে হল এটা যেন নিছক পরিহাস। কাকে কে জানে ? হয়ত মৃগাঙ্ককেই, হয়ত নিজের ভাগ্যকেই।

পথে এসে দাঁড়াল মৃগাঙ্ক।

দিন-ক্ষণের হিসেব দিয়ে খুঁটিনাটি কথা বলতে হলে অনেক কথা বলতে হয়। তার প্রয়োজন এখানে নেই। এ-কথা বললেই যথেষ্ট যে, একদিন বৃষ্টি-হয়ে-যাওয়া-সন্ধ্যেয় গড়ের মাঠের অন্ধকার থেকে যে-মেয়েটি উঠে এসেছিল—(এবং তারপর তাকে চায়ের দোকান আর চৌরঙ্গির আলোয় পুরুষ-সঙ্গিনী দেখে দেখে মৃগাঙ্ক যা ভেবে নিয়েছিল, এমন কি সেদিনের সেই সঙ্কুচিত নবদুর্গাও) আজ অন্যরকম হয়ে গেছে মৃগাঙ্কর চোখে। তিন মাস আগের একটি মেয়ে এই যে ধীরে ধীরে বদলে গেল আর একজনের চোখে—এর মধ্যে নিশ্চয় একটি কাহিনীর ধারা থেকে গেছে। সে-কথা এখানে উহ্য থাকল। মৃগাঙ্কর কৌতূহল কেমন করে আস্তে আস্তে আকর্ষণ আর সহানুভূতির মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে গেল তার ইতিহাস বলা হল না। না হোক, কি তাতে আসে যায়। একথাই যথেষ্ট যে মৃগাঙ্ক আর মায়ার মধ্যে এর পর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল।

মায়ার কথাটা ক্রমেই জানতে পারল মৃগাঙ্ক। গরীব ঘরের মেয়ে, সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখেছিল মফঃস্বল শহরের স্কুলে। মা মারা গেল। বাবার অবস্থা ছিল না বিয়ে দেন। বয়সটাও বাড়তে লাগল। ছেলে ছোকরারা সেই বয়সের দিকে তাকিয়ে শিস দিতে লাগল, চিঠি ছুঁড়তে লাগল। পাড়ায় সুশ্রী কুমারী মেয়ের চাল-চলনের দিকে নজর রাখার লোক থাকে বিস্তর। তারা শুভার্থী। তাদের

কথা পল্লবে পল্লবে বিস্তারিত লতার মত ছড়ায়। বিষলতা। সেই লতা মায়াকে জড়াচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মায়ার একটা বিয়ে হয়ে গেল। ছোট রেল স্টেশনের স্টেশনমাস্টার। বিপত্নীক। বয়স হয়েছে। ছেলেপুলের ঝামেলা নেই। অতএব চমৎকার সংসার। পাত্রর বয়স হয়েছে একটু, তো হোক। এমনিতে তো কোনো দোষ কি বদখেয়াল নেই। গান বাজনার সখ আছে। সে ত ভাল কথাই। বিনয়বাবুর সঙ্গে মায়ার বিয়েটা হয় এইভাবে।

মৃগাঙ্ক শুনে বলেছিল, 'তোমার বাবা তাহলে দায়মুক্ত হয়েছিলেন, মেয়ের বিয়ে দেননি।'

'যা ভাবো তুমি।' মায়া জবাব দিয়েছিল। তারপর একটু থেকে বলেছিল, 'নিঃসম্বল বাঙালী ঘরের মেয়েদের সব বিয়েই তাই।'

মৃগাঙ্ক আর মায়ার মধ্যে ততদিনে সম্পর্কটা এ-রকমই হয়ে এসেছে। সহজ নিঃসঙ্কোচ। ওরা দূরত্ব কাটিয়েছে, ঘনিষ্ঠ হয়েছে; পোশাকি ভদ্রতা সরিয়ে বন্ধু হয়েছে।

মায়া তার জীবনকথার পরের অধ্যায়টুকুও বলেছে ক্রমে ক্রমে। বিয়ের সময় বিনয়বাবু অন্ধ ছিলেন না। অন্ধ হয়েছেন বছরখানেক পর। বসন্ত রোগে। ভাগ্যের মার।

'আর ওই বাজনা?' মৃগাঙ্ক প্রশ্ন করেছিল।

'ওটা ছিল। আগে থাকতেই ছিল। শুনেছি কোন্ নামকরা বাজিয়ের কাছে শিখেছিলেন কিছুকাল। তারপর ওস্তাদ গেল, নেশা গেল না। বাজনা বলতে উনি বোঝেন এক সেই ওস্তাদ—ওঁর গুরুর বাজনা, তারপর নিজেরটা। ওঁর আফশোস— লোকে ওঁকে চিনল না, জানল না-বুঝল না।'

'তা তুমি ওকে পাঁচজনের সামনে দু একবার বার করবার চেষ্টা করলে না কেন।' মৃগাঙ্ক বলেছিল।

'করেছি।' মায়া খানিক চুপ। তারপর বললে, 'বাজালেই যদি বড় গুণী হওয়া যেত তবে আর কথা ছিল না। কিছু না উনি, ওঁর

ক্ষমতা নেই, সত্যি নেই, প্রতিভা নেই—শুধু গোঁ আছে আর মিথ্যে মোহ।'

'তার মানে কেউ পাত্তা দিলে না।' মৃগাঙ্ক যেন সান্ত্বনা দিল, 'আমি বিনয়বাবুকে দোষ দিই না। এ-রকম ব্যর্থতা আরও দেখেছি।'

মায়া আরও বলেছিল। বলেছিল, কিভাবে এই অন্ধ স্বামীকে নিয়ে তারপর তার জীবন কাটছে। চাকরী গেল! প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা, তাও গেল। অন্ধ হয়ে যাবার পর বিনয়বাবুর রোখ বাড়ল, গোঁ বাড়ল। নেশা চাপল।

'যদি শুধু দুটো কায়ক্লেশে পেটের অন্ন জোটানোর কথা হত মৃগাঙ্ক, আমি হয়ত পারতাম। এই চাকরী করেই হোক্ কি ভিক্ষে করেই হোক। কিন্তু তাতো শুধু নয়, ওঁর পেট ভরাতে হবে সেই সঙ্গে নেশা যুগিয়ে দিতে হবে। তার চেয়েও বড় কথা লোক জুটিয়ে আনতে হবে—যারা ওঁর সঙ্গে সঙ্গত করবে সারা সন্ধ্যে, অর্ধেক রাত পর্যন্ত। আর বাহবা দেবে!'

'সেকি?' মৃগাঙ্ক চমকে ওঠে!

'কোথায় আমি নিত্য নতুন লোক পাই বল তো। একবার যে আসে সে আর দ্বিতীয়বার আসতে চায় না। তাদের আমি দোষ দিই না। ওই অশ্রাব্য কান ঝালাপালা করা বাজনা শোনাই তো বিড়ম্বনা, তার ওপর যে-লোক সঙ্গত করবে তার সঙ্গে তাল মাত্রা ভুল নিয়ে তর্ক চেঁচামেচি, গালিগালাজ।' মায়া থামল খানিক। মৃগাঙ্ক চুপ বিহ্বল। শেষে মায়াই আবার বলল, 'তুমি তো বোঝো, বলেছি তোমায় আগেই, যারা আমার বাড়িতে যায় তাদের লোভটা কোথায়!' মায়ার স্বরে ক্ষোভ আর বেদনা।

মৃগাঙ্ক আজ সবই বুঝেছে। মায়ার পক্ষে কি দুঃসহ এক গ্লানি নিয়ে পথে পথে, পাড়ায়, চেনা-অচেনা মহলে পুরুষ-সঙ্গীত রসিক সঙ্গী খুঁজে বেড়াতে হয় তার স্বামীর জন্যে। আর যারা আসে তারা কিসের টানে আসে।

মায়ার কথা শুনতে শুনতে প্রথমটায় হতবাক হত। ভাবত, এ এক অবিশ্বাস্য কাহিনী। পরে নিজের চোখেই দেখেছে এই আপাত-অবাক-কাহিনীও কত সত্য।

কথা প্রসঙ্গে একদিন মৃগাঙ্ক বলে ফেলেছিল তার পূর্ব ধারণা। বলেছিল, 'কিছু মনে করো না, মায়া। তোমার সংসারের কথা খুঁটিয়ে জেনে তোমায় পতিভক্তির জন্যে বাহবা দেবে এমন ধৈর্য কারুর নেই। তারা যে অন্যরকম ভাববে। আমি যেমন ভেবেছিলুম। এই স্ক্যাণ্ডাল নিয়ে তোমায় থাকতে হবে।'

'জানি। সব জানি। কিন্তু উপায়!' মায়া জবাব দিয়েছিল, খানিক চুপ থেকে আবার বলেছিল, 'প্রথম প্রথম তবু লোকজন পেতাম। আজকাল আর পাই না। কথাটা যেন জানাজানি হয়ে গেছে।'

'ভালোই হয়েছে।' মৃগাঙ্ক স্বস্তি পায়।

'পরিণামটা কিন্তু ভাল হয়নি। মানুষটা দিনে দিনে আরও ক্ষেপে উঠেছে। আজকাল তার কথায় কথায় রাগ, চিৎকার, গালিগালাজ।'

'সহ্য কর?'

'উপায় কি!'

উপায়ের কথাটা আগে বলতে পারত না মৃগাঙ্ক। যদি-ও বা মনে হয়েছে, মুখ ফুটে বলতে পারেনি। আজকাল পারে। পারছে। বলেছে মৃগাঙ্ক, 'এভাবে নিজেকে নষ্ট করছ কেন? তোমার স্বামী অক্ষম, অমানুষ, অযোগ্য। চার বছরের স্বামীত্বের চেয়ে তোমার জীবনটা কম মূল্যবান নয়।'

'কি করবো বলো? কি করতে পারি?'

'যা করা উচিত।'

'স্বামী ত্যাগ?'

'যদি দরকার হয়, নিশ্চয় তাই। কত মেয়েই তো স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে পারে না।'

মায়া আর জবাব দিত না। কি ভাবত, কে জানে। মৃগাঙ্কও চুপ করে যেত।

এমনি ক'রে আরও ক'টা মাস কাটল। মৃগাঙ্ক-মায়ার সম্পর্কটা অস্পষ্ট ভাবে আরও গভীর, অন্তরঙ্গ হল। এবং জটিল। মৃগাঙ্ক অনুভব করতে পারল, সহানুভূতি কখন ভালবাসায় এসে ঠেকেছে। মায়াও বুঝতে পেরেছিল অনেকখানি পথ কখন অজান্তেই সে এগিয়ে এসেছে।

সেদিন যথাসময়ে মৃগাঙ্ক মায়ার ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল।

মায়া ছুটির পর বেরিয়ে আসতেই মৃগাঙ্ক বলল, 'তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।'

'জরুরী কথা না থাকলে কি আসতে না, না আসো না!' মায়া হাসল।

মৃগাঙ্ক এই পরিহাসের কোনো জবাব না দিয়ে বললে, 'একটু ফাঁকায় নির্জনে গিয়ে বসতে চাই।'

'আমার কিন্তু আজ খুব খিদে পেয়েছে। আগে চলো একটু চা খেয়ে নি।'

রেষ্টুরেণ্টে চা খেতে বসে মৃগাঙ্ক গম্ভীর, ভাবনা-ভরা মুখটা দেখতে দেখতে মায়া যেন ভবিষ্যৎটা আঁচ করতে পারল।

'রানীদি কিছু বলেছে?'

'বৌদি! না, নতুন আর কি বলবে? যা বলার তা তো বলছেই রোজ। ভাবছি বাড়ি ছেড়ে দেব।'

'তারপর—উঠবে কোথায়, হোটেল মেসে?' মায়া হাসছিল।

'উঠবো বলেই তো তোমার কাছে এসেছি! ভেসে বেড়াতে আমি ভালবাসি না।' মৃগাঙ্কর জবাবটা ইঙ্গিতপূর্ণ।

মায়া চুপ করে গেল। মৃগাঙ্ক সিগারেট ধরাল।

মৃগাঙ্কর স্বভাবটা মায়া জেনে ফেলেছে। এক একটা মানুষ এইরকম হয়। জেদী, স্থির। যা ভালবাসে, পছন্দ করে তা ভীষণ-ভাবে ভালবাসে, আর যা অপছন্দ করে তাকে ক্রমাগত ঠেলে সরিয়ে দিতে চায়। মায়া বুঝতে পেরেছিল, মৃগাঙ্ক আর মোটেই পছন্দ

করছে না মায়ার জীবনটা এইভাবে কাটুক, অন্ধ স্বামী আর এক খুপরির নোংরা ঘর নিয়ে।

পথে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাঠে এসে বসল ছ'জনে। তারপর কোনো ভূমিকা না করে কথাটা সরাসরি পাড়ল মৃগাঙ্ক।

'তোমায় স্পষ্ট করে ক'টা কথার জবাব দিতে হবে।'

মায়া তাকাল। মৃগাঙ্ক আজ যেন সমস্ত ব্যাপারটার হিসেব চুকিয়ে ফেলতে এসেছে। খুব আস্তে গলায় মায়া বলল, 'বলো।'

'বিনয়বাবুকে তুমি ভালবাস?'

মাথা নাড়ল মায়া। না।

'তুমি কি তার স্ত্রী হয়ে থাকতে চাও বাকি জীবনটা?'

'আমার চাওয়া না-চাওয়ায় কি আসে যায়?'

'যায়; যথেষ্ট যায়। শোনো আমি ঠিক করে ফেলেছি। তুমি যদি তোমার অক্ষম, অযোগ্য এবং নিষ্ঠুর স্বামীর ঘর করতে না চাও তোমার মুক্তি পাবার পথ আছে। আইন দিয়ে এই সম্পর্ক ভাঙতে হবে। আমি উকিল ঠিক করেছি। তোমায় যেতে হবে সেখানে।'

মায়া অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ মৃগাঙ্কর মুখের দিকে। মুখটা কী কঠিন, কী নিষ্ঠুর।

'আদালতে যেতে হবে?' মায়া অনেকক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে বললে।

'বিয়ের সময় ছাতনাতলায় দাঁড়াতে পারলে আর বিয়ে ভাঙার সময় আদালতে পারবে না?' মৃগাঙ্ক যেন ব্যঙ্গ করল।

মায়া ভাবছিল। একসময় জবাব দিল, 'দরকারে পড়লে তো শ্মশানে গিয়েও দাঁড়াতে হয়; কিন্তু ও কথা থাক্। তুমি কি সত্যিই উকিল ঠিক করেছ, এ-কথা বলেছ?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর—? ওর কি হবে?'

'কার?' মৃগাঙ্ক ইচ্ছে করেই অজ্ঞতা জানাল।

'ওই অন্ধ মানুষটার?'

'জানি না। জানতে চাই না। যা হোক হবে কিছু একটা। তোমার সেকথা ভেবে লাভ কি?'

'ভাবতুম না হয়ত যদি মানুষটা অসহায় না হত।'

মৃগাঙ্ক মায়ার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললে, 'অসহায়ের জন্যে যদি তোমার দরদ থাকে তবে এতো কথার দরকার নেই। আমি তোমায় স্পষ্ট করে বলছি মায়া, আমি সোজা মানুষ, সোজা কথা সোজা কাজ বুঝি। বিনয়বাবুর জন্যে যদি তোমার মন কাঁদে তবে সেখানে আমি নেই। আর যদি আমি থাকি বিনয়বাবু থাকবেন না।'

'তোমার দিক থেকে সোজা হওয়া যত সহজ, আমার দিক থেকে যে ততটা সহজ নয় মৃগাঙ্ক।'

'সেটা আমি বুঝি। কিন্তু আমার আপত্তিও সেখানে। নিজের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, বাঁচা, সুখ, শান্তি, ভালবাসার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করার চেয়ে নিষ্ঠুর হলেও সত্যটা প্রকাশ করা ভাল। যেখানে আর কোন আশা নেই, যে ভরসাও তুমি রাখ না সেখানে এই কায়িক-জীবন আর কতকাল কাটাবে? কেন কাটাবে?'

মায়া জবাব দিচ্ছিল না! মৃগাঙ্ক খানিকটা অপেক্ষা করে উঠতে উঠতে বলল, 'হিন্দু মেয়ের পতিভক্তির আদর্শের শেষ চূড়াটা অনেকেই বিজয় করেছে, তার জন্যে অস্বাভাবিক আর কোনো বাহবা কেউ পাবে না। এ-যুগটা অন্যরকম, অসৎ এবং আত্মপ্রবঞ্চনাকে এ-যুগ ঘৃণা করেছে। তুমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াও। এ-যুগ কখনোই তোমার গায়ে থুতু দেবে না। অন্তত যারা মানুষ।'

মৃগাঙ্ক জিনিসটা যত সহজ ভেবেছিল আসলে ব্যাপারটা অত সহজ হল না। উকিলের কাছে যাওয়া-আসা এটা-ওটা করতে করতে সময় কাটাচ্ছিল। কোনো ভরসা পাচ্ছিল না।

মনের দিক থেকে মৃগাঙ্ক ক্রমশই অস্থির থেকে অস্থিরতর হয়ে উঠেছিল। দাদা-বৌদির সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়ে বড় রকম একটা মনোমালিন্য ঘটে গেল। যার ফলে দাদার বাড়ি ছাড়ল মৃগাঙ্ক।

অন্য বাড়ি নিল। একা। ভাবল একদিন এই শূন্যতা ভরে যাবে।

এমন সময় একদিন মায়াদের সংসারে স্বামী-স্ত্রীর কলহটা খুব বিশ্রী একটা নোংরামিতে এসে ঠেকল। যার ফলাফলটা খারাপ হল। অন্তত তখনকার মতন। অন্ধ বিনয়বাবু ক্ষিপ্ত হয়ে কাঁসার গ্লাস ছুঁড়েছিলেন। আঘাতটা কপালে লেগেছিল। কিন্তু তা সাজ্ঘাতিক নয়। আসলে যে কথাগুলো বলেছিলেন, মায়ার মনে এবং বুকে সেগুলো সাজ্ঘাতিক হয়ে বেজেছিল।

এর ফলে মায়া ঘর ছাড়ল। মৃগাঙ্কর বাড়ি এসে উঠল। সম্পর্কটা যেন সে চুকিয়ে দিয়ে এসেছে।

দুটি কি তিনটি দিন। তারপর মনের আঁচ কখন নিভে গেছে। মায়া নিজেও ভাল করে বুঝতে পারেনি। সেই অন্ধ অসহায় মানুষটা কি করছে—কি ভাবছে, কেমন করে তার দিন কাটছে ভাবতে ভাবতে এক দুপুরে চলে গেল সেই পুরনো বাড়িতে।

মৃগাঙ্ক জরুরী কাজে বাড়ি ফিরে দেখে মায়া নেই। কোথায় গেল?

অনুমান করতে মৃগাঙ্কর কষ্ট হল না। মায়া তবে ফিরেই গেল! যাবে যাক, কিন্তু বলে গেল না কেন? মৃগাঙ্ক তো তাকে জোর করে আটকে রাখত না।

মৃগাঙ্কর মর্যাদায় বাধা দিল, কিন্তু কেমন একটা আকর্ষণ তাকে টানছিল। বিনয়বাবু স্ত্রীর এই অনুপস্থিতি কিভাবে নিয়েছেন, মায়াই বা কি কৈফিয়ৎ দিল?

মৃগাঙ্কও কেমন একটা বেঁহুশ মনে মায়ার বাড়ি গিয়ে হাজির।

শীতের দিন ছায়াময় হয়ে এসেছে বিকেল শেষেই। মায়াদের ঘরটা আরও অন্ধকার। সদর ভেজানো ছিল। আস্তে আস্তে খুলে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল মৃগাঙ্ক। ঘরের মধ্যে মায়া লণ্ঠন জ্বালছে। মৃগাঙ্ক চুপি পায় আরও একটু এগিয়ে এল।

বিনয়বাবুর কথাটা শুনতে পেল মৃগাঙ্ক। বিনয়বাবু বলছেন, 'হাসপাতালে তোমায় কি খেতে দিত?

'কি আর, ওই ভাত মাছ।' হেঁট মুখে লণ্ঠনের বিশ্রী শিসটা ঠিক করতে করতে জবাব দিল মায়া, 'ভাগ্যিস তেমন সাজ্ঘাতিকভাবে জখম হইনি, নয়ত কতদিন যে হাসপাতালের ভাত খেতে হত।'

একটু চুপ। বিনয়বাবু বললেন, 'কলকাতার রাস্তায় বড় ভিড়; একটু সাবধানে পথ হেঁটো।'

'তুমি খুব ভাবছিলে, না! আশ্চর্য কাণ্ড, হাসপাতালে গিয়ে তোমার ঠিকানা দিয়ে বলেছিলাম একটা খবর দিতে, ওরা দেব বলেছিল। অথচ দেয়নি।'

সে-কথার আর জবাব নেই। বিনয়বাবু হঠাৎ বললেন, 'তোমার পায়ের গোড়ালি তাহলে ঠিক হয়ে গেছে! এখন আর খোঁড়াচ্ছ না?'

'সামান্য।'

'তোমার চোখ থাকতে যে কি করে গাড়িঘোড়ার গায়ে গিয়ে পড় বুঝি না। আমি অন্ধ। আমার হলে তবু কথা ছিল।'

মৃগাঙ্কর কানে কথাটা কেমন যেন শোনাল। ভীষণ অর্থবহ, ইঙ্গিতময়। একটুর জন্যে মৃগাঙ্ক সব ভুলে গিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

মৃগাঙ্ক চলে যাচ্ছিল। কিন্তু মায়া ততক্ষণে উঠোনে এসে গেছে।

'কে, মৃগাঙ্ক?' মায়া আস্তে গলায় ডাকল।

ঘরের মধ্যে তখন সেতারের ঝঙ্কার ভেসে উঠেছে। মৃগাঙ্ক দাঁড়াল। মায়া কাছে এগিয়ে এল। একেবারে পাশটিতে। কি বলবে না বলবে কিছু ঠিক করতে না পেরে মায়া বোবার মত বলল, 'আমি ওকে দেখতে এসেছিলাম।'

'কেমন দেখলে?' মৃগাঙ্কর গলায় স্পষ্ট বিদ্রূপ।

'আমি হাসপাতালের কথাটা মিথ্যে করে বললুম।' মায়া ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিল।

'মিথ্যেই ত তুমি বল। ওটাই তোমার ধর্ম।'

মায়া চুপ। কাঁধ থেকে আঁচলটা গায়ে পড়ে গেছে কখন। উঠোন অন্ধকার। ঘরে সেতার বাজছে। হঠাৎ মায়া যেন ফুঁপিয়ে ওঠার

একটা আবেগ সামলে মৃদু গলায় বললে, ‘মৃগাঙ্ক, তুমি রাগ করতে পার—কিন্তু বুঝতে পার না, এ দায়িত্ব যে বড় বিশ্রী, ভীষণ। তোমার কাছে গিয়েও যে এ-লোকটা কি খাচ্ছে, কি পরছে সে-কথা আমি ভুলতে পারি না। আর কিছু নয়—শুধু এই দায়িত্বটুকু কেউ নিক, আমি স্বচ্ছন্দে তোমার কাছে চলে যেতে পারব।’

মৃগাঙ্ক কোনো জবাব দিল না। আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

দিন পাঁচেক আর দেখা নেই মৃগাঙ্কর। মায়া অনেক কিছু অনুমান করল, ভাবল। মৃগাঙ্কর বাড়ি গেল। দেখা পেল না।

তারপর আচমকা মৃগাঙ্ক এসে হাজির। হঠাৎ যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে।

‘আমি একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছি মায়া, তুমি যদি রাজী হও।’

‘বলো।’

‘তোমরা দু-জনে আমার বাড়িতে উঠে এস।’

‘তাতে তোমার লাভ?’

‘লোকসানই বা কি!’ মৃগাঙ্ক হাসল, ‘একপাশে তোমার স্বামী থাকবে আর একপাশে আমি। একদিকে সংস্কার আর একদিকে ভালবাসা। মাঝখানে তুমি। এই পীড়ন অহরহ তুমি ভোগ কর। তারপর যেদিকে তোমার পাল্লা ঝোঁকে।’

‘ছেলেমানুষি করো না মৃগাঙ্ক।’

‘বা, ছেলেমানুষির কি আছে! এটা তো একটা পরীক্ষা।’

‘এ-পরীক্ষা নতুন করে দেবার আমার দরকার নেই।’

‘তুমি তাহলে রাজী নও?’

’অশান্তি বাড়িয়ে লাভ?’

মৃগাঙ্ক একটু ভাবল। বললে, ‘বেশ। পরীক্ষা না হয় দিয়ো না। অন্য একটা জিনিস তবে দাও।’

‘কি?’

'আমার চোখের সামনে থাক। আমি শপথ করছি, তোমার দুর্বলতার সুযোগ নেব না। সামনে একটা অন্ধ স্বামী খাড়া করে রেখে আমার সঙ্গে ইতর সম্পর্ক পাতাও—তাও আমি চাই না। শুধু আমার কাছে থাক, চোখের সামনে।'

মায়ার চোখে জল এসে পড়েছিল। বোবা মুখে শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি দিল।

নতুন বাড়িতে একটা মাস কাটল। মৃগাঙ্ক যেন কেমন হয়ে গেছে। আগের সেই উগ্রতা, সেই অসহিষ্ণুতা, আর নেই। বরং ও এখন শান্ত, সংযত।

বিনয়বাবুর ওপর মৃগাঙ্কর যেন এতোদিন পরে হঠাৎ চোখ পড়েছে। প্রায়ই গল্প করে। বলে, 'আপনি এবার একটু বাজান তো, শুনি।'

'তুমি হঠাৎ এতো সঙ্গীত-রসিক হয়ে উঠলে যে?' মায়া পরিহাস করে জিজ্ঞেস করে।

'রসিক হতে সময় অসময়ের বাধা নেই। তা ছাড়া, ভদ্রলোক তো ভালই বাজান। তুমি যে কেন ছি ছি করতে বুঝি না।'

'গানবাজনার তুমি কি বোঝো?'

'কিছু না। যারা বোঝে, যারা সত্যিকারের সমঝদার তাদের কাছে এবার নিয়ে যাব ওঁকে। এই অপরিচয় থেকে ওঁকে আমি উদ্ধার করব।'

'একটা কেলেঙ্কারী তুমি করবে মৃগাঙ্ক।'

'কেলেঙ্কারী—!' মৃগাঙ্কর বুক থেকে ভীষণ একটা ভয় যেন লাফিয়ে গলায় উঠে এল।

মৃগাঙ্কর কথা-মতন কাজ। বিনয়বাবুকে মাঝে-মধ্যেই নিয়ে বেরুচ্ছিল ও, এখানে সেখানে; গানের ঘরোয়া আসর আর গুণীদের কাছে।

একদিন বেরিয়ে গেল বিকেলে। তারপর আর অনেক রাত পর্যন্ত ফিরল না। গভীর রাতে ফিরল। মায়া উৎকণ্ঠা নিয়ে জেগেছিল। মৃগাঙ্কর বিপর্যস্ত চেহারা।

অ্যাকসিডেণ্ট। রাস্তা পেরুতে গিয়ে ট্রামের সঙ্গে ধাক্কা, লাইনের মধ্যে পড়েছেন বিনয়বাবু। হাত ধরেই রাস্তা পার করাচ্ছিল মৃগাঙ্ক। তবু কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল!

আশা নেই। হয়ত আজকের রাতটা বাঁচবেন আর।

পরের দিন বিনয়বাবু মারা গেলেন।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে মায়া চুপ; মৃগাঙ্কও। অনেক রাত্রে মৃগাঙ্ক শুধু একবার কাছে এসে বলল, 'মায়া, আমিই ভুল করলুম। যদি না রাস্তাটা পেরুবার চেষ্টা করতাম!—বিশ্রী লাগছে আমার। মনে হচ্ছে, এই কাণ্ডটার জন্যে আমিই দায়ী।

'তুমি দায়ী হবে কেন? মৃত্যু ভাগ্য। ভাগ্যে ছিল। তুমি কি করবে?'

'বুঝি সব, তবু—'

'ও কিছু না। অনেক দুঃখ থেকে ও মুক্তি পেয়েছে।'

মৃগাঙ্ক নীচু মুখে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল এক শনিবারে—তারপর দেখতে দেখতে কতগুলো শনিবার কেটে গেল কিন্তু এ-বাড়ির আবহাওয়া তেমনি থাকল। বড় বেশি বিষণ্ন, নিস্প্রাণ। এটা অস্বাভাবিক।

মায়াকে দেখলে মনে হত জীবনে সে অনেক সয়েছে, অনেক শিখেছে বলে এই ঘটনাকেও অক্লেশে সয়ে যেতে পেরেছে। বাস্তবিক মায়ার আচার আচরণে কদাচিৎ এই প্রসঙ্গটা উঠত। বরং বলা যায়, কথাটা সে কখনোই ওঠাতে চাইত না। পাছে মৃগাঙ্ক এ-প্রসঙ্গে অন্যকিছু মনে করে। মৃগাঙ্ক বলেছিল—তা সত্ত্বেও মায়া এ-বাড়িতে বিনয়বাবুর শ্রাদ্ধটা পর্যন্ত করেনি। কালিঘাটে সেরে এসেছিল। এ সবই মৃগাঙ্ককে বোঝাতে যে, যতকাল তার দায় ছিল দায়িত্ব ছিল ততকাল বিনয়বাবুর জন্যে সে করেছে। এখন আর কেন? মায়া চাইত, জীবনে যখন জট পাকিয়ে গিয়েছিল তখন যে কষ্ট ওরা পেয়েছে—এবং যার আশা সুদূর হয়ে গিয়েছিল, এখন আর সে-কষ্ট সইবে কেন?

ভাগ্যই বিনয়বাবুকে মায়ার জীবনে ছুঁড়ে দিয়েছিল, ভাগ্যই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। হয়ত রূঢ়, কিন্তু ঈশ্বর ত' এইভাবেই পথ পরিষ্কার করে দিয়েছেন। যদি তাঁর দেওয়া দুঃখটা মাথা পেতে নিয়ে থাকি, মুক্তিটাই বা না নেব কেন ?

মায়া সহজ হতে চাইত। চাইত ধীরে ধীরে এ বাড়িতে আবার জীবনের রঙ লাগুক। দুটো শব্দ হোক, কিছু হাসি, কথা, গল্প।

কিন্তু কি আশ্চর্য—মায়া যা চাইছিল, মৃগাঙ্ক তা পারছিল না। মৃগাঙ্ক সেই ঘটনার পর দিন দিন যেন কেমন হয়ে যেতে লাগল। বিভিন্ন, নিঃসঙ্গ, পীড়িত।

মায়া মৃগাঙ্ককে দেখত আর ভাবত। যখন দেখত না তখন অনুমান করবার চেষ্টা করত, কেন ও এমন হয়ে যাচ্ছে! কি হয়েছে ওর! মায়ার মনে হত, মৃগাঙ্ক আজও এই আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্যে বড় বেশী গ্লানি আর দুঃখ নিয়ে রয়েছে। ও হয়ত ভাবছে, মায়া তাকে এর জন্যে দায়ী করেছে। কিন্তু সত্যিই তো মায়া তা করছে না। বিনয়বাবুকে মৃগাঙ্ক চায়নি, তার মানে এ-নয় যে, মৃগাঙ্ক তাকে ট্রামের তলায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে নিজের পথ করে নিয়েছে। তা সম্ভব নয়।

কথাটা তুলব-না তুলব-না করেও একদিন মায়া বলে ফেলল। বলল মৃগাঙ্ককে, 'কি হয়েছে তোমার ?'

'আমার ?' মৃগাঙ্ক চমকে উঠল হঠাৎ, 'কই না, কিছু না।'

'আমায় ফাঁকি দিয়ে লাভ কি ? মিথ্যে কথা বলো না; যা হয়েছে বলো।'

মৃগাঙ্ক ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে যেন। তার মুখ চোখ স্বাভাবিকতা হারিয়ে কেমন সাদা হয়ে গেল। কথার জবার দিতে পারল না। তারপর হঠাৎ চটে উঠল। বলল, 'আমি মিথ্যেবাদী ? কি মিথ্যে বলেছি তোমার কাছে ? কোথায় ফাঁকি দিয়েছি তোমায় ?'

মায়া মৃগাঙ্কর এরকম আচরণ প্রত্যাশা করেনি। ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল। মৃগাঙ্কও আর সামনে বসে থাকেনি, উঠে চলে গিয়েছিল।



পরে আবার একদিন মায়া মৃগাঙ্কর মনটা যখন মোটামুটি ভাল তখন শুধলো, 'তোমার শরীর কি ভাল যাচ্ছে না ?'

'কেন ?'

'খুব শুকিয়ে যাচ্ছ দিন দিন। চোখ মুখ দেখলে মনে হয় যেন রাতে ঘুমোও না। খুব একটা তুশ্চিন্তা নিয়ে আছ।'

মৃগাঙ্ক মায়ার চোখের দিকে একপলক চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। তারপর বলল, 'আমায় কি অসুস্থ দেখাচ্ছে আজকাল ?'

'হ্যাঁ। তুমি একটা রোগে পড়বে এরপর।'

খানিক্ষণ আর কথা নেই। তারপর মৃগাঙ্ক বললে খুব ঝাপ্‌সা গলায়, 'ও কিছু না। অফিসের একটা গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়েছি। মনটা একটু অস্থির রয়েছে।'

এইভাবে আরও কিছুদিন কাটল। মায়া তবু মৃগাঙ্কর মনের ধরা ছোঁয়া পেল না। মায়ার কাছেও ব্যাপারটা ক্রমশই অস্বস্তিকর হয়ে উঠছিল। শেষ পর্যন্ত কথাটা ও নিজেই তুলল।

'এভাবে আর থাকতে পারছি না।'

'মানে, কিভাবে ?' মৃগাঙ্ক সিগারেটটা নিভিয়ে দিল।

'আমাকে তুমি খাঁচার পাখি করে রেখেছ। দানা ঠুকরোচ্ছি আর ঘুমোচ্ছি।'

'তুমি কি ওড়া-পাখি হতে চাও ?' মৃগাঙ্কর ঠোঁটে বেঁকা হাসি।

'বিদ্রূপ করছ ?' মায়া আহত হল।

'না—না।' মৃগাঙ্ক তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিল, 'ওটা কথার কথা। হ্যাঁ, কি বলছিলে ? এভাবে থাকতে ভাল লাগছে না ?'

'না লাগাই স্বাভাবিক। এ বাড়িতে আমি একটা মানুষ রয়েছি তা যেন তুমি ভুলে গেছ।'

'কি যে বলো' মৃগাঙ্ক হাসবার চেষ্টা করল।

'বলাবলি নয়, কি হয়েছে তোমার আমায় স্পষ্ট করে বল। আমি তোমায় আগে দেখেছি, এখনও দেখছি। তুমি ভুলোনা ম্যাগাঙ্ক, তোমার প্রতিদিনের কথা, ব্যবহার, তোমার কি চাওয়া

ছিল—এসব এত তাড়াতাড়ি আমি ভুলে গেছি! সব আমার মনে আছে।'

মৃগাঙ্ক মায়ার দিকে চোখ চেয়ে তাকাতে পারছিল না। মুখ ঘুরিয়ে খুব একটা বোকা বোকা ভাব করবার চেষ্টা করছিল এবং কাঁপা হাতে সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিল। তাড়াতাড়ি কোনো জবাব দিল না। গলাটা একটু হালকা করে মৃগাঙ্ক বলল, 'কি যে সব বলছ তুমি! আমি অন্যায়টা কি করেছি বল! তোমায় দুঃখ দিয়েছি কিছু?'

'দুঃখ তুমি কাকে বলো?' মায়ার সত্যিই কান্না পাচ্ছিল। বললে, 'আজকাল তোমার ব্যবহারটা যেন কেমন?'

কথাটা কোনপথে গড়াবে তা অনুমান করে মৃগাঙ্ক তাড়াতাড়ি সেটা চাপা দিতে চাইল। বলল, 'তোমায় বলিনি, প্রয়োজন ছিল না তেমন। সেই মামলাটা আমি উঠিয়ে নিয়েছি। অযথা উকিলের পেছনে পয়সা খরচ করে আর লাভ কি! আর এখন তো আমরা বিয়ে করতেই পারি। আমি সেকথা যে না ভাবি তা নয়, কিন্তু ঠিক এখুনি এই ব্যাপারটায় তুমি রাজী হবে কি হবে না—' মৃগাঙ্ক থামল।

কথাগুলোয় মায়া আরও ক্ষুব্ধ, বিরক্ত বোধ করল। বলল, 'আমি বিয়ের জন্যে তাগাদা দিচ্ছি না।'

'না সেকথা নয়; যদি বলো এখনও হতে পারে।' মৃগাঙ্ক উঠে দাঁড়াল।

'বিয়ে হলেই কি তোমার ব্যবহারটা বদলে যাবে রাতারাতি?'

মৃগাঙ্ক বুঝতে পারল যে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা আর চলবে না। বলল, 'বেশ তো বলো, আমার ব্যবহারে কি দোষ খুঁজে পেলে?'

'বলতে হবে?'

'বলো না, আমি যখন বুঝতে পারছি না।'

মায়া ভাবল এরপর আর কিছু বলা যায় না। তবু মনের তখন এমন অবস্থা যে, রোখের মাথায় বলেই ফেলল। বলল, 'তুমি আমায় আজকাল সব সময় এড়িয়ে থাকতে চাও।'

'কি যে—' মৃগাঙ্ক আবার ভয় পেতে শুরু করল।

'কি যে নয় ; কথাটা সত্যি। তুমি যতটা পার সরে সরে থাকতে চাও। স্পষ্ট করে বলো না কেন, কি চাও তুমি।' একটু থামল মায়া। আবার বললে, 'তোমায় আমি বলছি মৃগাঙ্ক, কোনো বিয়েতেই আমার লোভ নেই যদি না মানুষটাকে আমি নিজের করে পাই। জানি না তুমি কি ভাবছ, কিসের ভাবনা আর খুঁতখুঁতুনি নিয়ে আছ—,তবে তুমি যদি মনের দিক থেকে বদলে গিয়ে থাক, তবে সহজ করে আমায় বল। আজ আমার পথ খোলা আছে।'

মৃগাঙ্ক খানিকক্ষণ বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল।

আবার একদিন কথাটা উঠল। মায়া বললে, 'কাল সারারাত পায়চারি করেছ কেন ?'

মৃগাঙ্ক চায়ের কাপে মুখ দিতে যাচ্ছিল। মুখ উঠিয়ে বলল, 'কে বললে ?'

'আমি জানি। এ ঘর থেকে আমি তোমার হাঁটা-ফেরার শব্দ শুনেছি।'

মৃগাঙ্ক জবাব দিল না।

'কি হয়েছিল তোমার ? ঘুম আসছিল না।'

মৃগাঙ্ক মাথা নাড়ল।

'কাল তুমি মদ খেয়ে বাড়ি ফিরেছিলে রাত করে। ক'দিন ধরেই খাচ্ছ। কেন ?'

মৃগাঙ্ক সভয়ে মায়ার দিকে চাইল।

মায়া যেন আজ কঠিন একটা সঙ্কল্প নিয়ে এসেছে। একটু থেমে বললে স্পষ্ট গলায়, 'আমি বুঝতে পেরেছি।'

'বুঝতে পেরেছ ? কি বুঝতে পেরেছ ?' মৃগাঙ্কর সমস্ত মুখটা সাদা। মনে হচ্ছিল কেউ যেন ওর গলা টিপে ধরেছে।

মায়া মৃগাঙ্কর এই ভীত বিহ্বলতায় ভীষণ অবাক হয়ে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বললে, 'আমার জন্যে যদি এইসব উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে—আমি চলে যাব। যদি চাও,

আজই চলে যেতে পারি। দায় বড় বিশ্রী জিনিস। আমি চাই না—আমার দায় তুমি জীবনভর বইবে। তার চেয়ে যাকে তোমার ভাল লেগেছে তাকে ঘরে নিয়ে এসে রাখ। মানুষের মতন বাঁচ।'

মায়া আর কথা বললে না, চলে গেল।

মৃগাঙ্ক চুপ করে বসে থাকল।

সারাটা দিন ঘরে বসেই কাটলো মৃগাঙ্কর। সেই একই কথা ভেবে ভেবে। মাথার শিরাগুলো ছিঁড়ে যাবার মতন হয়ে যন্ত্রণা দিতে লাগল। চোখের কোলে একরাশ আলপিন যেন ফোটান রয়েছে, এমনি ব্যথা। তাকাতে পর্যন্ত পারছিল না।

সন্ধ্যে শেষ হল। মায়াও আজ এ ঘরে আর এল না। বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকল মৃগাঙ্ক। বাতিটাও জ্বালল না।

ভাবছিল মৃগাঙ্ক। আবার সেই ভাবনা ঃ আমি কি মায়াকে ভালবাসি নি? বেসেছি। একটা মানুষ যতটা ভালবাসতে পারে একটা মেয়েকে তারচেয়ে এক বিন্দু কম নয় আমার এই ভালবাসা। শখের নয়। দুর্বলের নয়। আমি মায়াকে স্ত্রী করে পেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার উপায় ছিল না। মায়ার স্বামী ছিল; যে-স্বামী অন্ধ, অপদার্থ, অযোগ্য; মায়াকে যে গ্লানির পথে নামিয়েছে, নির্যাতন করেছে। এই লোকটাকে আমি ঘৃণা করতাম। মনে-প্রাণে ঘৃণা। ও আমার শত্রু ছিল। ও না থাকলে মায়াকে আমি পেতে পারতাম। লোকটা এক বাধার মতন ছিল। অনড়। সে যাবে না, আর মায়াও শুধু অসহায় একটা লোকের খাওয়া পরা থাকার কথা ভেবে কিছুতেই তাকে সরিয়ে দিতে পারছিল না। মায়ার এই দুর্বলতা আমায় অস্থির, অধৈর্য করে তুলত। সে কেন এত বড় অন্যায় সহ্য করবে? কেন মানুষ তার ভাগ্যের ভূতটাকে ধাক্কা দিয়ে পথে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে যেতে পারবে না! আর ওই অন্ধ, অপদার্থটা কেন আমাদের জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকবে!

তা বলে, আমি, আমি—না, না, সেরকম কোনো ইনটেন্‌শান সত্যি আমার ছিল না! বিনয়বাবুকে মেরে ফেলব—তাকে ট্রামের

চাকার তলায় ফেলে দেব ধাক্কা দিয়ে এরকম সত্যিই আমি কিছু ভাবি নি।

তবে কেন ওকে আমি রাস্তায় বের করে নিয়ে যেতাম ? কেন—কেন ?

অন্ধকারে বালিশের বুকে মুখ লুকিয়ে মৃগাঙ্ক যেন সাজ্ঘাতিক একটা প্রশ্নর আঘাত থেকে বাঁচতে চাইল।

তারপর মনে মনে বলল : স্বীকার করছি, আমি অদ্ভুত একটা হিংসা বোধ করছি। আমার ইচ্ছে হত ওকে—ওই অন্ধটাকে গাড়ি ঘোড়ার চাকার তলায় ফেলে দি। ও মরুক। আমাদের পথ পরিষ্কার হোক।

হ্যাঁ, আমার ইচ্ছে হত। কিন্তু বাস্তবিক আমি তা করিনি। ইচ্ছে তো কত রকমেরই হয়। কাউকে খুন করতে ইচ্ছে হওয়া মানে তাকে খুন নয়।

কিন্তু সেদিন কি যেন হয়ে গেল। ট্রামটা আসছিল। আমি বিনয়বাবুর হাত ধরেছিলাম একহাতে, আর এক হাতে তাঁর সেতার। ফুটপাত থেকে নেমে রাস্তা যখন পেরুচ্ছি আমিও জানতাম না, ট্রামটা আসছে। বড় কাছাকাছি যখন ট্রামটা—আমি দেখতে পেলাম। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। পিছু ফিরব, না টপকে পেরিয়ে যাব লাইন ভাবতে না ভাবতেই আমি বিনয়বাবুর হাত ছেড়ে দিয়ে পলকে লাইন টপকে গেলাম। বিনয়বাবুও—

বিনয়বাবুকে আমি চাকার তলায় ঠেলে দিয়েছি ? না, না, না।

তবু মনে হয় আমি দায়ী। আমি যেন ওটাই চেয়েছি।

বিনয়বাবু চলে গেলেন। কিন্তু আমার মনে একি অশান্তি ? চোখের ঘুম গেল, স্বস্তি গেল, সুখ গেল, এমন কি মায়ার কাছে যেতে পর্যন্ত আমার সাহস হয় না। মনে হয়, ও সব বুঝেছে ; বুঝে ফেলেছে। আমার চোখে মুখে এই কলঙ্কের কথা লেখা হয়ে গেছে। মায়া কি আর না বুঝবে ?

মাঝে মাঝে মনে হয়, মায়া কিছুই সন্দেহ করে না। হয়ত তাই। আমি তো কিছুই করিনি। তবু—? তবু তো সে দৃশ্য আমি ভুলতে পারছি না। আমার মন কিছুতেই তা ভুলতে দিচ্ছে না।

টক্ করে সুইচ্ টিপে বাতি জ্বলে উঠল। মৃগাঙ্ক চোখ চেয়ে দেখল। মায়া।

‘রাত যে দশটা বাজতে চলল। খেতে যাবে না?’

কাছে এগিয়ে আসতেই মায়ার চোখ পড়ল মৃগাঙ্কর মুখে। সে-মুখ যেন মানুষের নয়। মৃগাঙ্কর দুই চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। মায়া অবাক। তার মুখে কথা আসছিল না। শেষে অনেক কষ্টে বললে, ‘কাঁদছ! কি হয়েছে?’

মৃগাঙ্কর মুখে জবাব নেই। মায়া ওর মাথার কাছে এসে বসল। মুখে হাত দিয়ে একটু জল আঙুলে মেখে নিল, ‘কি হয়েছে তোমার?’

মৃগাঙ্ক হঠাৎ ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে মায়ার হাত দুটো নিজের মুখের ওপর চেপে ধরল।

এক সময়ে এই আবেগ থামল। মৃগাঙ্ক বললে, ‘একটা কথা আমায় বলবে মায়া?’

‘বলো।’

‘তুমি কি মনে কর বিনয়বাবুকে আমি ধাক্কা দিয়ে ট্রামের তলায় ফেলে দিয়েছি--’

চমকে উঠল মায়া। এরকম অবাক জীবনে আর হয়নি সে। বুকটা তার কেঁপে উঠল। গলার কাছে অদ্ভুত একটা ভয় এসে জমল।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে মায়া বলল, ‘আমি তা ভাবতে যাব কেন? তুমি তো মানুষ। একটা মেয়েকে পাওয়ার জন্যে একটা অন্ধকে ট্রামের চাকার তলায় ফেলে দেওয়া—না, না, এ কাজ তুমি পার না। কোনো মানুষই পারে না।’

মৃগাঙ্কর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বললে, ‘কেউ জানে না মানুষ কখন কি পারে আর না পারে। তবে—?’ মৃগাঙ্ক হঠাৎ চুপ করল।

‘কি?’ মায়া তাকাল।

‘আমি জানি একটা জিনিস মানুষ পারে না। তোমার ভালবাসার জন্যে আর একটা মানুষকে তুমি ঘৃণা করার কথাও ভাবতে পার না।’

মায়া আরও খানিক বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠল।

মৃগাঙ্ক বললে, 'কী আশ্চর্য মায়া, একদিন ভাবতুম তোমাকে পেলেই আমি সুখী হব। আজ দেখছি তুমি একা একটি মেয়ে শুধু নও—তুমি একটা গোটা মনুষ্যত্ব। তোমার মধ্যে আমি আছি, বিনয়বাবু আছে, অসংখ্য মানুষের হয়ে তুমি আছ। এই মনুষ্যত্বের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস আর আমার নেই।'

মায়া চলে যাচ্ছিল। মৃগাঙ্ক ডাকল। মায়া মৃগাঙ্কর চোখে চোখে তাকাল। থামল একটু, তারপর কি যেন বলবার চেষ্টা করল। পারল না। ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মৃগাঙ্ক অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল।

থাটাল

এ আমাদের ছেলেবেলার গল্প। মণ্টু, বিশু আর আমার।

তখন আমরা এইট্ নাইন্ ক্লাশের ছাত্র সব। মফস্বল শহরে মিশনারী স্কুলে পড়ি; থাকি স্কুলের কম্পাউণ্ডের পাশে ফুলঝোপের কাছে একটা মেটে লাল রঙের বাড়িতে। ওকে ঠিক বাড়ি বলে না। কি যে বলে, বলা উচিত—আমরা তা জানতাম না। মণ্টু আমাদের বাড়ির ডেফিনেশান শিখিয়ে দিয়েছিল, বলেছিল, দেওয়াল তোলা দরজা জানালা বসানো গোটা কয়েক ঘর না হলে সেটা বাড়ি হয় না। বুঝলি! এই বোর্ডিংটা বাড়ি নয়।

বিশু আমাদের তিন জনের মধ্যে সব চেয়ে জ্ঞানীগুণী, কলকাতা শহর দেখা ছেলে। আমরা যা জানতুম না, বিশু তার অনেক কিছুই জানত। বোর্ডিংটা যদি বাড়ি না হয়, তবে কি—মাঠ না ময়দান? এই প্রশ্নের জবাবে বলেছিল, এটা একটা খাটাল, বুঝলি—খাটাল।

আমি ছিলাম সবচেয়ে বোকা আর গেঁয়ো। খাটাল দেখিনি, কাকে বলে তাও জানতাম না। বিশুকে শুধোলাম, 'খাটাল কি রে?'

বিশু গুলতি তৈরী করছিল কাঠবেড়ালি মারবে বলে। আমার কথায় খুব একচোট হেসে নিয়ে বললে, 'খাটাল জানিস না, গরু মোষ যেখানে থাকে—'।

তা কথাটা বিশু কিছু খারাপ বলেনি। আমাদের সেই বোর্ডিংকে খাটাল বললে অন্যায় কিছু হয় না। পায়ের নীচে সিমেণ্ট ওঠা মেঝে আর মাথার ওপর মাটির খাপরার ছাদ। আলকাতরা মাখানো গোটা কয়েক লম্বা লম্বা থাম। দু চারটে জানলা অবশ্য আছে। দুটি মাত্র দরজা। ব্যস্, আর কিছু নেই। কিংবা আর যা আছে, যেমন মাথার ওপর গাদা গাদা ঝুল, ফাঁক ফোকরে কয়েক ডজন টিকটিকি, পাখিদের বাসার খড়কুটো জঞ্জাল—এসব নিশ্চয় ঘরের শোভা নয়। সেই লম্বা

একটা চালা-ঘরের মতন বাড়িতে আমরা প্রায় জনবিশেক ছেলে মাথা গুঁজে থাকতাম। রোদ টোদ বড় একটা পেতাম না। হাওয়াটা অবশ্য ফুটো ফাটা দিয়ে মন্দ খেলত না।

মণ্টু প্রায়ই বলত, এই স্কুলে সে আর পড়বে না; এই বাজে জায়গায় আর থাকবে না। মাত্র পাঁচ মাইল দূরে সাহেব মিশনারীদের স্কুল আছে, আঃ, একেবারে প্যালেস। এটা দিশী মিশনারীদের স্কুল কি না, বুঝলি কাঞ্চন, পয়সা কড়ি নেই, তাই এমন হাল।

মণ্টু আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত। এবং বিশু কথাটা শুনেও যেন শুনত না।

বোর্ডিংটা হয়ত বাস্তবিকই খারাপ ছিল। কিন্তু আর কিছু তো তেমন খারাপ ছিল না। অন্তত আমাদের লাগত না। স্কুল আর বোর্ডিংয়ের কম্পাউণ্ডের পরই ছিল একটা মেহেদীর বেড়া, করবী গাছের ঝোপ দিয়ে বেড়াটাকে আরও ঘন দুর্গম করা হয়েছিল। বেড়ার ও-পাশটায় মেয়েদের স্কুল—বোর্ডিং। একই নাম স্কুলের, মেয়েদেরও যা, আমাদেরও তাই। স্কুলের আশে-পাশে মাঠ আর গাছ। শিশু, দেবদারু, কাঁঠাল, আম। উত্তর দিকটায় শুধু ছোট ছোট পলাশ ঝোপ। সিকি মাইলটাক হেঁটে গেলে দামোদর নদী। আমরা দল মিলে প্রায়ই যেতুম বেড়াতে।

বলতে কি, বোর্ডিংটা যতই খারাপ হোক, জায়গাটা বেশ ভালই ছিল, বেশ স্বাস্থ্যকর। কুয়ার জল, খেতে একটু মাটি মাটি স্বাদের লাগলেও নিশ্চয় খুব হজমী ছিল। কেননা, তখন খাটালের মধ্যে থেকেও কই আমাদের কারুর তো কোনদিন অসুখ বিসুখ করেনি। বরং গায়ের রংটা যতই কালচে হয়ে আসছিল, ততই শরীরটা ফুলছিল সকলের। মণ্টুটা তো হুস হুস করে ফুলছিল। বিশু বলত, ইস্ তুই যে একেবারে টায়ারে পাম্প দেওয়ার মতন হয়ে যাচ্ছিস। একদিন পান্‌চার হয়ে মরবি।

জবাবে মণ্টু বলত, যা যা, তা হলে ডলি সোম কবে মরে ভূত হয়ে যেত।

কাথাটা ঠিক। ডলি সোম—আমাদের স্কুলের গার্লস সেকসানের মেয়ে। ওর মাসী না পিসী কে যেন মেয়েদের টীচার। মেয়েদের বোর্ডিংয়ের কাছে টীচার কোয়ার্টার্সে থাকে।

বিকালে যখন সবাই মাঠে খেলা করতাম কি বেড়াতাম—কিংবা বুড়ো চীনেবাদাম-ওয়ালার কাছ থেকে দু চার পয়সার বাদাম কিনে খেতাম আর গোল হয়ে বসে গল্প করতাম—তখন প্রায়ই বিকেলে এক ঝাঁক বকের মতন—মেয়ে বোর্ডিংয়ের আট দশটি ছোটবড় মেয়ে আমাদের কাছ থেকে খানিক তফাতে হয় খেলা করত, না হয় বেড়াত, আর সেই বুড়ো চীনেবাদামওয়ালাকে হাত নেড়ে কাছে ডাকত। ডলি সোমকে তখনই আমরা দেখেছি। নামটা কি করে জেনেছিলুম, মনে নেই।

চীনেবাদামওয়ালাকে আগে ডাকা পরে ডাকা নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে আমাদের ছেলেদের দলের কয়েকবার খুব ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। একবার তো ঝগড়াটা এমন বেধে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত কলকে ফুলের গাছ থেকে টপাটপ তার ফল পেড়ে রীতিমত দু'দলে যুদ্ধ। আমাদের ফার্স্ট ক্লাশের হীরুদা অ্যায়সা তাগ করে ছুঁড়েছিল একটা ফল যে ডলি সোমের নাকটি আর একটু হলেই ফাটতো।

সে-কথা যাক, ইদানীং—অর্থাৎ সেই ঝগড়াঝাটির পর মেয়েদের দলে একজন করে টীচার থাকতে শুরু করলেন। বিশু তা দেখে হেসে বলত, কুইন অফ দি গুজ।

আমরা সবাই হাসতাম।

আমাদের ওখানে—স্কুল কম্পাউণ্ডের মধ্যে ডিসেম্বর মাসে একটা মেলা মতন হত। অ্যানুয়াল পরীক্ষাটা হত মাসের প্রথম দিকেই। তার দু চার দিন পরেই মেলাটা বসত। চলতি কথায় বলা হত, চিলড্রেনস্ শো। এ সময় স্কুলটায় কী আমাদের, কী মেয়েদের—খুব একটা সাড়া পড়ে যেত। মাষ্টার মশাইদের মাথা খারাপ হবার যোগাড় হত। একদিকে পরীক্ষার খাতা দেখা অন্যদিকে এই মেলার নানা রকম ঝামেলা সামলানো।

তা আম, কাঁঠাল, শিশু, দেবদারুর ঝোপ আর পাতায় ভরা ছায়ার মধ্যে স্কুলটা এ সময় হঠাৎ যেন ঝলমলিয়ে উঠত। নতুন করে মেটে লাল রঙের কলি ফেরান হত বাড়িগুলোর গায়। যত রাজ্যের পাখি এসে বসবার জন্যে খড় ছাওয়া গম্বুজ মতন যে 'নেস্ট'টা ছিল—তার গায়ে চুনকাম হত, নতুন খড়ের আচ্ছাদন পড়ত। শহর থেকে ভাড়া করা ডায়নামো আসত। বিজলী বাতি জ্বলে উঠত চারপাশে। প্যাণ্ডেল সাজানো হত ফুল দিয়ে, বাতি দিয়ে। আর নীল, সবুজ, লাল রঙের বাতি জ্বলতো গাছের ডালে ডালে।

এই মেলায় মেয়েদের হাতের কাজ থাকত। তাঁতের কাজ থেকে শুরু করে ছুঁচের কাজ মায় হাতে আঁকা ছবি পর্যন্ত। আরও কত টুকিটাকি। আমরা, ছেলেরাও কিছু কমতি যেতাম না। কার্পেণ্টারী আর ক্লে-ওয়ার্ক ক্লাশের নানারকম কেরামতি স্টলে সাজাতাম। দু দশ-খানা ছবি পর্যন্ত। কিন্তু ঈশ্বরের কী নির্দয় পক্ষপাতিত্ব ; মেয়েদের স্টল থেকে হাতের কাজ, ছুঁচের কাজ, আচার, বড়ি পর্যন্ত বিকিয়ে যেত আর আমাদের হাজার ঘ্যানর ঘ্যানর হাতে পায়ে ধরা সত্ত্বেও যারা মেলা দেখতে আসত কেউ কিছু কিনত না, ছেলেদের স্টল থেকে। বড়জোর বিরক্তি এড়ানোর জন্যে কোন সদাশয় যদি একটা পালক গোঁজা ঝাড়ন কিনতেন আনা আস্টেক দিয়ে।

প্যাণ্ডেলে যে সব উৎসব হত তাতেও মেয়েদের একচেটিয়া অধিকার। গান গাইছে তো গাইছেই, নাচছে তো ওরাই সারাটা সন্ধ্যে স্টেজ নিয়ে নিল। আর ছেলেদের মধ্যে হীরালালদার দল যখন জিমনাস্টিক দেখাল, গলা দিয়ে লোহার শিক বাঁকালো তখন প্যাণ্ডেল প্রায় খালি। হাততালি দেবার জন্যে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই।

সেবার আমরা তাই ঠিক করেছিলাম—ছেলেরা আর কিছু করবে না। স্টল নয়, কোন রকম শো নয়। কিছু না। নাথিং। বিশু তীর আর ছোট ধনুক নিয়ে লক্ষ্যভেদের একরকম সার্কাসী খেলা দেখাত। চমৎকার খেলা। সে খেলাও দেখান হবে না এবার।

আমাদের—ছেলেদের একটা মিটিং বসল পলাশ ঝোপে। এবং সবাই এক সঙ্গে মাথা নেড়ে রিজলিউশন নিয়ে নিলাম, আমরা নন-কোপারেশান করব। এক শুধু ভলেন্টিয়ারী ছাড়া। কেন না সেটা না করলে গোলমাল ঘটাবার সুযোগ পাব না।

আমাদের হেড্ মাষ্টার মশাই ছিলেন রেভারেণ্ড মণ্ডল। বুড়ো মানুষ। একগাল দাড়ি। পাদ্রীগোছের চেহারা। বেশ একটা হাসি হাসি ভাব মুখে। ছেলেদের সিদ্ধান্ত শুনে কাছে ডাকলেন। অনেক বোঝালেন বললেন, বাবারা—এটা তোমরা ভাল কাজ করছ না। দশ বছরের মধ্যে এরকম তো আর কোন ছাত্ররা করেনি।

আমরা অনড়। আজেবাজে কৈফিয়ত দিতে লাগলাম। কার্পেণ্টারীতে এবার ভাল কিছু হয়নি ; ক্লে-ওয়ার্ক ক্লাসের কাজও ভাল নয়। হীরালালদা পাশ করে চলে গেছে— তার হয়ে ফিজিকাল ফিট্‌স্ দেখাব এমন কেউ নেই—ইত্যাদি ইত্যাদি।

রেভারেণ্ড মণ্ডল বিশুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি, হালদার, তোমার সেই তীর ধনুকের খেলা—?'

হঠাৎ দেখি বিশু ভিড়ের মধ্যে থেকে তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত নিয়ে দু-পা এগিয়ে গেল। আমরা অবাক। বিশু হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধল কখন। কেন?

ডান হাতের গোবদা এক ব্যাণ্ডেজ দেখিয়ে বিশু বলল, 'আমার স্যার কব্জি ভেঙে গেছে।'

'কব্জি ভেঙে গেছে?' হেড্ মাস্টার মশাই যেন বিচলিত হলেন।

বিশু তাড়াতাড়ি বলল, 'ঠিক ভাঙা নয় স্যার—মচকে গেছে। ভীষণ ফুলেছে। কী ব্যাথা। টনটন করছে।'

রেভারেণ্ড মণ্ডল অগত্যা হতাশ হয়ে আমাদের বিদায় দিলেন।

আমরা ছেলের দল অসহযোগ করলেও যথাসময়ে মেলা বসল। এবং এবার শীত একটু যেন কম থাকায় লোকজনের যাওয়া আসা আগের চেয়েও বেশি বেশি মনে হচ্ছিল।

প্রথম দিন আবার প্যাণ্ডেলে মেয়েদের পক্ষ থেকে ওদের হেড্ মিস্ট্রেস ঘোষণা করে দিল, এবার মেয়েরা নাচ গান ছাড়াও কী একটা পালা অভিনয় করবে।

বলতে বাধা নেই, আমরা—স্কুলের বিশেষ করে বোর্ডিংয়ের সেই সব দুষ্টু ক'টি ছেলে বেছে বেছে ভলেণ্টিয়ার হয়েছিলুম যারা চুপি চুপি ষড়যন্ত্র এঁটেছিলুম—ভলেণ্টিয়ারির নাম করে এবার গণ্ডগোল একটা বাধাবোই। প্রত্যহ। নানা ছুতো নাতায়।

প্রথম দিন তেমন কিছু সুবিধে করা গেল না। এক যা ডলি সোমের দলের সঙ্গে খানিকটা বচসা হয়ে গেল।

দ্বিতীয় দিনে মণ্টু মেয়েদের গানের মাঝখানে এক চাবি ফটকা ফাটিয়ে একটু যা বিরক্ত করতে পারল শ্রোতাদের। তাছাড়া দল বেঁধে নানা দিক থেকে হাঁচি কী কাশি—তাতেও কিছু হল না। হাসির এপিডেমিক ছড়াবার একটা উদ্ভট ফন্দিও বৃথা গেল।

তৃতীয় দিনে ছিল মেয়েদের সেই পালা অভিনয়। আজ একটা হেস্ত নেস্ত করতেই হবে—এই সংকল্প আমাদের মনে। চার পাঁচটা দলও গড়া হল।

তারপর যথারীতি সবাই সারাদিন মেলায় ঘুরে ঘুরে ফন্দিগুলোকে ঝালিয়ে নিলুম। মণ্টু বললে, আজ আমি অ্যায়সা ব্যাঙ ডাকব না দেখিস, তোরা সব জয়েন করবি। প্যাণ্ডেলে ফ্রগ্ মার্কেট বসিয়ে দেব।

কেষ্ট বললে, আমাদের স্কাউট-রুম থেকে আমি বিউগল্‌টা বাগিয়ে এনে রেখেছি। যেই না ড্রপ উঠবে—দেব প্রাণপণে বাজিয়ে।

আমাদের এতো ফন্দি। কিন্তু বিশুর কোন ফন্দি নেই। সে চুপচাপ। যেন এসব বাঁদরামির মধ্যে সে নেই। থাকতেও চায় না।

সন্ধ্যে হল। মেলার জলুস বাড়ল। রঙিন বাতির মালা। শীতের কুয়াশা আর ঠাণ্ডা। মেয়েদের অভিনয় দেখতে আজকে ভিড়টা বেশি। খান কয়েক গাড়ি, বাহারী সব বউ-ঝি। স্টলে ভিড়, পথে ভিড়। আমরা যে যার মতন তৈরি হচ্ছি।

সন্ধ্যে একটু ঘন হয়ে উঠতেই প্যাণ্ডেলে আর তিল ধারনের ঠাঁই নেই। অভিনয় শুরু হয় প্রায়।

মেয়েরা কী যে অভিনয় করছে আমরা অত বুঝিনি বুঝতেও চাইনি। তবে চোখের সামনে দেখছি—আলোয় ধোয়া স্টেজের মধ্যে খুব জমকালো রাজা রানীর পোশাক পরে সব তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, গান গাইছে, নাচছে। আর মাঝে মাঝে হাততালির শব্দ।

ওদের নাটকটা বোধ হয় জমে উঠেছিল খুব। মণ্টু ফ্রগ্ মার্কেট বসাবে বলেছিল, চেষ্টাও করেছিল, ফলে তাড়া খেয়ে প্যাণ্ডেল ছেড়েছে। অরে এদিকে স্টেজের ওপর তখন ঝকমকে পোশাক পরে রাজকুমারী এসেছেন—সঙ্গে গুটি চার পাঁচ সখী। হাতে জ্বলন্ত প্রদীপ। প্রদীপ-গুলি গোল করে এক জায়গায় নামিয়ে রেখে সবাই মিলে খানিকটা হাসিঠাট্টার পর—নাচতে লাগল।

হঠাৎ হঠাৎ—কোথাও কিছু নেই– রানীর এক সখি 'উ মাগো' বলে চিৎকার করে একেবারে প্রদীপগুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এই সখি সেই মোটা ডলি সোম।

কি হলো, কি হলো ? হৈ চৈ ! ছুটোছুটি। গণ্ডগোল গোলমাল। সখীর কাপড়ে ধপ্ করে আগুন লেগে গেছে। আগুন, আগুন। হুটোপাটি। ড্রপ্ পড়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা জানা গেল। কে যেন হাতখানেক লম্বা একটি কঞ্চি বেশ টিপ্ করে ডলি সোমের কপালে ছুঁড়েছে। ভুরুর ওপর এসে লেগেছে সেই মুখ ভোঁতা শর। ডলি সোম মুখে হাত ঢেকে বসতে গিয়ে প্রদীপের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। তার ফলে অগ্নিকাণ্ড।

বিশুকে সবাই সন্দেহ করল। এ রকম অব্যর্থ টিপ্ বিশু ছাড়া কারুর হতে পারে না। কিন্তু বিশুর ডান কব্জিতে মোটা এক ব্যাণ্ডেজ। তার ওপর সে এমন যন্ত্রণাদায়ক মুখচোখের ভঙ্গি করতে লাগল যে—সন্দেহ সত্ত্বেও তাকে হাতে নাতে ধরা মুশকিল হয়ে পড়ল।

ডলি সোমের গালের পাশটা পুড়েছিল। আর কপালের কাছে কিছু চুল। বেশ কিছুদিন ভুগল ডলি সোম।

তারপর ?

তারপর অবশ্য আমরা জানতে পেরেছিলুম সবই। বিশুও খুব আনমনা হয়ে পড়েছিল। প্রায়ই সে নিজের মুখ দেখত আর মাঝে মাঝে লুকিয়ে কোথায় যেন পালাত। আর বলত, আমাকে আর মণ্টুকে —সত্যিই আমরা খাটালে থাকি, বুঝলি— ! ঠিক জায়গায়। গরু মোষ ছাড়া আমরা আর কিই বা ; কতকগুলো জন্তু।

প্রায় বছর বাইশ পরে সেই বিশুর সঙ্গে সেদিন আসানসোল স্টেশনেদেখা হয়ে গেল। চেকারের কাজ করছে। কালো রেলের কোট, লাল টাই। একটু মোটা হয়েছে।

প্রথমে চিনতে পারিনি। তারপর আনন্দে দিশেহারা হয়ে ডাকলাম —বিশু, এই বিশু ?

বিশু তাকাল। চিনতে পারল।

দুই বন্ধুতে খানিক গল্প হল। শুধোলাম, 'সেই ডলি সোম যাকে পুড়িয়ে মেরেছিলি তার খবর কি ?'

বিশু হাসল। বললে, 'আমি তাকে একবার পুড়িয়ে মেরেছিলাম। সে আমায় এখন রোজ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে।'

বিশুর হাসিটা এত সুন্দর লাগল। আর আমার মনে হচ্ছিল, না, না—বিশু ভুল বলেছিল তখন—আমরা খাটালে ছিলাম না, জন্তুও ছিলাম না। জন্তু কখনও এমন হয় না। খাটালের বাসিন্দা এতোটা ভাবে না, করে না। গালপোড়া মেয়ে ডলি সোমের জন্যে বিশু যা করেছে।

ধোঁয়া

দিন কয়েক আগের কথা।

ঘরকুণো মানুষ আমি। সন্ধ্যেবেলায় নিজের ঘরটিতে বসে নিরিবিলি আলস্য-সুখ উপভোগ করছিলাম। সামনের জানালাটা খোলা। অল্প তেজের রঙিন বাতির নীলাভ আলোটুকু স্নিগ্ধতা রচনা করেছে। বাইরে বর্ষাভেজা অল্প অল্প হাওয়া। জানলার পর্দা নড়ে উঠছিল মাঝে মাঝে। ঠিক-বোঝা-যায়—না এমন কিছু শব্দ আসছিল বাইরে থেকে। তবু কান পেতে থাকলে ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যায়। রেডিয়োর মিহি-সুর গানের অস্পষ্ট কলিও বোধ হয়। একটা পোকা নীল আলোর চক্র থেকে অন্ধকারে বার বার উড়ে যাচ্ছিল, ফিরে আসছিল আবার।

এমন সময় টুক্ করে চল্লিশ পাওয়ারের বাতিটা জ্বলে উঠল ঘরে। নীলবাতি নিভে গেল। মোলায়েম আমেজটা কেটে গিয়ে কটকটে সাদা আলোয় চোখ যেন অল্পক্ষণের জন্যে ধাঁধিয়ে গেল।

কমলা সামনে দাঁড়িয়ে। সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে। শুধলো, 'চেয়ারে বসে বসে এই ভর সন্ধ্যেবেলায় ঘুমোচ্ছিলে নাকি?' কথাটা শেষ করে কমলা একবার দরজার দিকে তাকাল। মুখে কেমন একটু রহস্যের আভাস।

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কোনো রহস্যই অনুধাবন করবার চেষ্টা করলাম না। তিন বছরের বিবাহিত জীবনে এ-অভিজ্ঞতা আমার হয়ে গেছে, স্ত্রীদের অনন্ত রহস্য কোনো স্বামীরই একদফার পরমায়ুতে সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

বললাম, 'ঘুমোবো কেন! এমনি বসে আছি। ওই বাতিটা আবার জ্বাললে কেন? বেশ তো নীল বাতিটা জ্বলছিল।'

কমলা কথাটা কানে তুলল না। বলল, 'তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে।'

'আমার সঙ্গে?' আমি অবাক। অবাক হবার মতনই কথা। এ পাড়ায় আমি নতুন এসেছি। মাত্র দিন পনেরো আগে। এখানের লোকালয় ছোট। আলাপী মানুষ আমার কেউ নেই। তবে আবার কে আসবে?

কমলা দু-পা এগিয়ে গেল দরজার দিকে। তারপর মাথা নুইয়ে কাকে যেন ডাকল, 'আসুন না, চলে আসুন।'

যিনি এলেন তাঁকে আমি কখনও দেখিনি। কমলাদের বয়সী এক মহিলা। বিবাহিতা। একটু যেন মোটা চেহারা। ফরসা রঙ। মুখের ছাঁদটি মন্দ নয়। হাসি হাসি চোখ। খোঁপা পর্যন্ত ঘোমটা তোলা। হালকা রঙের শাড়ি পরনে।

বোকা এবং বোবার মতন ক'পলক মহিলার দিকে তাকিয়ে কমলার দিকে চাইলাম। অস্বস্তি বোধ করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না, উঠে দাঁড়াব—না মহিলাকে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বলব।

আমার হতভম্ব ভাবটা লক্ষ্য করে মহিলা হাসিমুখেই বললেন, কমলাকে উদ্দেশ্য করে, 'আমায় চেনা অবশ্য এখন মুশকিল কমলাদি। অনেককাল পরে তো! তখন আবার বড্ড রোগা ছিলাম।' মহিলা দিব্যি অসঙ্কোচ গলায় আর ভঙ্গিতে বললেন কথাগুলো।

সঙ্কোচ বোধ করছিলাম আমি। অস্পষ্ট গলায় বললাম, 'ঠিক মনে করতে পারছি না; আপনি বোধ হয় কমলার কোনো বোন টোন—'

কথাটা শেষ হল না আমার, কমলা আচমকা হেসে উঠল জোরে। মহিলাও।

হাসি থামলে, কমলা মহিলাকে হাত ধরে চেয়ারটায় বসিয়ে দিল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওর নাম মীরা। এ-পাড়াতেই থাকে। ওই যে জবাফুলের গাছ আছে—ওই বাড়িটায়।' কমলা প্রাথমিক পরিচয়টা করিয়ে দিয়ে এবার বলল, 'এখন বাপু কে কার বোন বোনঝি তোমরাই হিসেব করে দেখ। আমি যাই, উনুনে চায়ের জল ফুটে ফুটে বোধ হয় শুকিয়ে গেল।'

কমলা চলে গেল।

আমি নতনেত্র। মনের কুঠরী হাতড়ে কোথাও মীরা নামে পরিচিত কাউকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

ক'মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর মীরা বলল, 'আপনি না কিছুদিন পীতাম্বর মুন্‌সি্‌ লেনে থাকতেন?

কথাটা মিথ্যে নয়। মীরার দিকে তাকালাম। পীতাম্বর মুন্‌সী লেনের মীরা যে কে কিছুতেই ঠাওর করতে পারলাম না। বললাম, 'হ্যাঁ, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে কিছুদিন ছিলাম। সে তো অনেক দিনের কথা। ছ'সাত বছর তো হবেই।'

'জানি'। মীরা বলল, 'আপনার সেই বন্ধুর নাম মোহিত।'

আমি বুঝতে পারছিলাম না, আমাদের এত পরিচয় যার জানা, তার পরিচয় আমি কেন ঠাওর করে উঠতে পারছি না। কি আশ্চর্য! অসঙ্কোচে বললাম, 'আমি কিন্তু আপনাকে কিছুতেই ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'পারছেন না?' মীরা ঠোঁট টিপে হাসল। ক'পলক আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বললে, 'সকাল সন্ধ্যে যার উনুনের ধোঁয়া খেয়ে চোখ লাল করতেন, লাফালাফি করতেন—'

মীরার কথাটা আর শেষ হল না। ধোঁয়া? শুধু ওই শব্দটা কানে যেতেই সব কুয়াশা পরিষ্কার হয়ে গেল। ছ'সাত বছরের জমা গাঢ় ধোঁয়ায় যে-মুখ, যে-মানুষ হারিয়ে গিয়েছিল কোথায়, মুহূর্তের জাদুতে যেন সে স্পষ্ট হয়ে উঠল। মনে পড়ল মীরাকে। ফরসা, রোগা, একমাথা চুল, মলিন বেশ, মুখরা মেয়ে মীরা। তখন তার বয়স ছিল বড়জোর পনেরো ষোল।

অবাক অথচ খুশীর সুরে আমি বললুম, 'আরে কি আশ্চর্য, আপনি —সেই মীরা। কি কাণ্ড! এতক্ষণ তো বলতে হয়। আমি একেবারেই চিনতে পারিনি।'

'তা তো পারবেনই না। চেনার মতন কিছু আছে নাকি?' মীরা হেসে হেসে বলল, সহজ গলায়, 'তখন কি বিচ্ছিরী রোগা ছিলাম,

এখন কি রকম মোটা হয়ে গিয়েছি দেখছেন না।' একটু থেমে আবার বললে, 'আর তখন ছিলাম ছেলেমানুষ—এখন তো—'

কথাটা মীরা শেষ করল না, মুচকি হাসল। লঘু সুরে আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তখন ছেলেমানুষ আর এখন পাকা গিন্নী।'

'পাকা না হলেও, আধপাকা বলতে পারেন। ছ'জন মানুষের সংসার একা সামলাই।' মীরা হেসে জবাব দিল। আবার বলল, 'আমি কিন্তু রাস্তায় প্রথম দিন দেখেই চিনতে পেরেছিলুম। আপনার চেহারাও কিছুটা বদলেছে।'

'না কি?' আমি হাসি। বলি, 'বয়স হচ্ছে তো! একটু মেদ বৃদ্ধি হচ্ছে, দু-চারটে চুল পাকছে মাথার।'

কমলা এল এমন সময়। হাতে চায়ের কাপ। চা বিলি করতে করতে বলল, 'কি শেষ পর্যন্ত চেনা গেল!'

'হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লুম, 'একসময় একই বাড়িতে অল্প কিছুদিন আমরা ভাড়াটে ছিলুম।'

'ওঁরা ওপর তলার'—মীরা যেন একটু খোঁচা দিয়ে বলল, 'বুঝলেন কমলাদি, ওঁরা ছিলেন ওপর তলার ভাড়াটে—আর আমরা নীচের তলার।'

প্রায় আধঘণ্টা খানেক থাকল মীরা। কমলার সঙ্গেই কথা হল বেশি। আমার সঙ্গে অল্প। এ-পাড়ার জল, মশা থেকে শুরু করে বাজারে মাছের আকাল—এমনি সব সাংসারিক কথাবার্তা। তারপর বিদায় নিল মীরা।

বললাম, 'ভালোই হল। আসবেন মাঝে মাঝে বেড়াতে।'

মীরা ঘাড় নাড়ল। বলল, 'আপনি না বললেও আসব। কিন্তু আমায় অতো আপনি-আজ্ঞে করছেন কেন? আগে তো তুমি বলতেন। আড়ালে হয়ত গালটালও দিতেন। কে জানে!' মীরা হাসল, 'সম্মানে আমার কাজ নেই। তুমিই বলবেন, বুঝলেন।'

হাসতে হাসতে বিদায় নিল মীরা। কমলা তাকে সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। ঘরে এসে কমলা বলল, 'কি গো, একেবারে তন্ময় যে! কি ভাবছ?'

'ধ্যাত্‌—তন্ময় আবার কি? এমনি ভাবছি। মজা মন্দ নয়। কোথায় কবেকার সেই মীরা, টিঙটিঙে একটা মেয়ে। একমাথা চুল। মিলের শাড়ি। কি তার দাপট আর গলার জোর—আমরা তো রেগুলার ভয় করতাম—'

কমলা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। বলল ভ্রূভঙ্গি করে, 'ভয় করতে? আর কিছু না তো?'

'আবার কি! তোমার যতসব—'

'দায়টা এখন আমারই কি না!' কমলা হাসতে হাসতে চায়ের কাপ কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

কমলা চলে গেল। কিন্তু কোথায় যেন একটা ছোট্ট ঘূর্ণি তুলে দিয়ে গেল। কিংবা বলা ভালো, নিস্তরঙ্গ জলে যেন ছোট্ট এক টুকরো পাথর ছুড়ে দিল খেলাচ্ছলে।

মীরাকে খুব স্পষ্ট করে মনে পড়ছিল এবার। নানা কথা। কটকটে বাতিটা যেন সে-সব কথাকে বড উগ্র করে তুলছিল। বাতিটা নিভিয়ে আবার নীল বাতিটা জ্বেলে দিলাম। সিগারেট ধরালাম একটা।

নীলাভ আলোর স্নিগ্ধতায় সিগারেটের ধোঁয়ায়—আস্তে আস্তে আর এক ধোঁয়ার কাহিনী মনে পড়ছিল।

বছর ছ'সাত আগের কথা। তখন সবে বি-এ পাশ করে ল ক্লাসে ঢুকেছি। ওকালতি করবো এমন বাসনা নিয়ে নয়। নেহাৎ কিছু একটা না করছি জানলে, অবিবেচক পিতাঠাকুর মশাই কলকাতা থাকা নাকচ করে বাড়িতে ফিরে যেতে বলবেন—তাই ল ক্লাসের ধাপ্পা দিয়ে তাঁকে নীরব রেখেছি। আসলে সে-সময় এন্তার আড্ডা মারছি, আর সাহিত্যচর্চা করছি। আর চাকরির দরখাস্ত। আমার বন্ধু মোহিত মার্চেন্ট অফিসের কেরানীগিরি করত, আর কবিতা লিখত। হ্যাঁ, আর ডিসপেপসিয়ায় ভুগত। মেসের খাওয়া-দাওয়ায় শরীর নষ্ট হচ্ছে, চেঁচামেচিতে কাব্যচর্চায় ব্যাঘাত ঘটছে বলে পীতাম্বর মুন্‌সী লেনের এক বুড়ো থুড়থুড়ে বাড়ির দেড়খানা কামরা সে ভাড়া করেছিল। কুকারে নিজের হাতে রান্না করে খেত। আর বুকে বালিশ দিয়ে কবিতা

লিখত। মোহিতের বিশেষ অনুরোধে আমি তার সঙ্গে থাকতে এলুম সেই দেড় কামরার ঘরে। বাড়িটা যদিও জীর্ণ, তবু খুব নিরিবিলি ছিল। নীচের দুখানা অন্ধকার ভ্যাপ্‌সা ঘর। ফাঁকা। নীচের কলতলায় শ্যাওলা জমে জমে কালো হয়ে গেছে। কাঠের নড়বড়ে সিঁড়ি। সব সময় ছায়া ছায়া ভাব। বলতে কি, আমরা দুই বন্ধু মোটামুটি ভালই ছিলাম। কুকারের রান্নাটাই যা জিভে রুচতো না।

হঠাৎ একদিন দেখি—নীচের দু-খানা ভ্যাপ্‌সা অন্ধকার ঘর ভাড়া হয়ে গেছে। আর নতুন ভাড়াটে এসে গেছে। প্রায় প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক; একটি বিধবা—বয়স্কা মহিলা আর বছর ষোলোর একটি মেয়ে।

যেদিন ওরা এল, ঠিক তার পরের দিন সকালেই আমাদের মেজাজ চড়ে গেল। সবে ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসেছি। এক-রাশ কটু ধোঁয়া গলায় ঢুকে গেল। তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলুম না। শুধু চাপ চাপ ধোঁয়া—নীচের তলা থেকে মহা উল্লাসে এঁকেবেঁকে ফেঁপে-ফেনিয়ে দোতলায় উঠে ছড়িয়ে পড়ে ঘর-বারান্দায় থই থই করছে। কিচ্ছু দেখা যায় না। নিশ্বাস আটকে আসে। চোখ জলে ভরে উঠল।

টুথব্রাশ হাতে নিয়ে বোকা বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলুম। কি রে বাবা, নীচে কি অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে নাকি?

ধোঁয়া সরলো বোধ হয় মিনিট পনেরো-কুড়ি পরে। তাকিয়ে দেখি, মিলের শাড়ি পরা আঁট করে খোঁপা বাঁধা অল্প বয়সী মেয়েটি হাতের পাখা দিয়ে শেষবারের মতন হাওয়া করে নিচ্ছে তাদের তোলা উনুনে। আর উনুনটা চাতালে নামানো—ঠিক আমাদের দু-হাত বারান্দার নীচে।

ধোঁয়া গিললেও সেদিন আর কিছু বলা গেল না। চুপচাপ নীচে নেমে গিয়ে মুখ ধুয়ে এলুম।

নীচের তলার ভাড়াটেদের পরিচয়টা পরে জানা গেল। ভদ্রলোকের ছোট্ট একটা কাপড়ের দোকান আছে মির্জাপুরে কোথায়। বিধবা মহিলা তাঁর বোন। মেয়েটি ভদ্রলোকের। নাম মীরা।

পরিচয় জানতে আমরা উৎসাহী ছিলাম না। ভদ্রলোক যেচে এসেই দিয়ে গেলেন।

কিন্তু পরিচিত হবার পরও ধোঁয়ার বাহার কমল না। রোজ সকাল আর বিকেলে সেই তোলা উনুন নীচের চাতালে যথাসময়ে নামতে লাগল, আর প্রবল প্রতাপে ধোঁয়া উদ্গীরণ করতে লাগল।

ভদ্রতার খাতিরে দু-চার দিন এ অত্যাচার সহ্য করা গেল। তারপর অসহ্য হয়ে উঠল। মোহিতকে বললাম, 'এ-ভাবে দুবেলা ধোঁয়া খেলে ফুসফুসটি যাবে আমার। আচ্ছা, অভদ্র তো ওরা। একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়। তুই ভদ্রলোককে বল।'

ভদ্রলোককে বলাও হল। কিন্তু তাতে ফল ফলল বিপরীত। সেই মেয়েটা যেন খুঁজে খুঁজে কাঁচা কয়লা ক'ঝুড়ি আনিয়ে একেবারে সিঁড়ির পাশে উনুনে রেখে ধোঁয়া খাওয়াতে লাগল।

চটেমটে একদিন বললুম, 'তোমার উনুন ধরাবার কি আর জায়গা নেই? দু-বেলা এ কি শুরু করেছ?'

জবাবে মীরা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করে রাখলেই পারেন। আমি কি রাস্তায় গিয়ে উনুন ধরাব নাকি?'

'রান্নাঘরে ধরাও।' আমি সতেজে বলি।

জবাব দেয় মীরা, 'রান্নাঘর একটা তৈরি করিয়ে দিন না; বাড়ি-অলাকে বলে।'

জবাব শুনে মনে হয় ঠাস করে এক চড় মারি ওর গালে।

মীরা আমাদের সকল অনুরোধ, শাসানি অগ্রাহ্য করল। ওইটুকু মেয়ে, কিন্তু কি তেজ! কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে জবাব। যেন আমাদের মুখে মুখে জবাব দেবার জন্যেই ও এসেছে।···একদিন অসহ্য হয়ে—দিলাম এক বালতি জল ঢেলে। তারপর সে কী কেলেংকারী। মীরার বাবা চুপ, কিন্তু এক মীরা শত মীরা আর সহস্র জিহ্বা হয়ে আমাদের দু-বন্ধুকে একেবারে মাছভাজা করে ছেড়ে দিল।

আমরাও মরিয়া হয়ে গেলাম। এক ফোঁটা মেয়ের কাছে তুচ্ছ এই হার যেন ভীষণভাবে লাগল। ভীষণ অপমান বোধ করলাম।

ফলে যতরকম বদবুদ্ধি মাথায় এল—সব একে একে প্রয়োগ করলাম—মাঝরাতে দোতলা থেকে দম্ করে এক ইঁট ফেলে দিতাম নীচে। একগণ্ডা বন্ধু এনে তারস্বরে চিৎকার-চেঁচামেচি করতাম রাত দশটা পর্যন্ত। তবু ধোঁয়ার দেবীকে কাবু করতে পারলাম না।

কাবু হওয়ার মেয়েই যেন নয় মীরা। তার চলন-বলনে বেপরোয়া ভাব। গলার স্বর যেন ফেটে পড়ত সব সময়। সারাটা দিন তার চেঁচানি। কখনও বাবাকে অভিযোগ করছে, কখনও পিসিকে। থেকে থেকে ওপরের দিকে মুখ তুলে কটুভাষণ করতে ছাড়ত না। হয়ত মোহিত স্নান করতে গিয়ে চৌবাচ্চার জল বেশি খরচ করেছে—মীরা সময়মতন ওপরের দিকে তাকিয়ে তার ধারালো বাক্যবাণ ছুঁড়ত, 'মাথায় তেল দিচ্ছ কেন পিসি মিছিমিছি, জল আছে নাকি যে চান করবে? রাজপুত্তুররা গন্ধ-সাবান মেখে চান করে গেছেন।'

এ-সব কটুবাক্য আমরা নীরবে শুনতাম না ঠিক। লাগসই জবাবও ছুঁড়তাম নীচু পানে। তার সব ক'টা সব সময় হয়তো যথেষ্ট ভদ্র হতো না। না হোক্।

অথচ কুকারের রান্না আধসেদ্ধ হয়ে পড়ে থাকলে কেমন করে যে আমাদের খাবারটা নীচে থেকে ওপরে উঠে আসত তাও ঠিক বুঝতাম না।

মোহিত বলত, মেয়েটার সব সহ্য করতে পারি যদি ও ধোঁয়া দেওয়া বন্ধ করে।

আমি বলতুম, ওর কোনো কিছুই বরদাস্ত করতে আমি রাজি নই। যেমন চেহারা, তেমনি গলা আর স্বভাব।

মাস চারেক পরে হঠাৎ এক কাণ্ড হল। তিন দিনের নোটিশে মীরার বিয়ে হয়ে গেল। মিথ্যে বলব না, মীরার হাত থেকে চিরকালের মতন নিস্তার পাচ্ছি এই সুখে—আমরা দু-বন্ধু মীরার বিয়েতে খানিকটা খেটে দিলাম। এমন কি চাঁদা করে ওকে একটা ইলেকট্রিক স্টোভ পর্যন্ত কিনে দিলাম। শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় মীরা আমাদের

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ম্লান হাসি হেসে বিদায় নিল। ভাবলাম, বাঁচা গেল।

কিন্তু পরের দিন সকালে উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই মনে হল, কি যেন নেই। কি যেন পাচ্ছি না। বড় পরিচিত, প্রার্থিত কি যেন হারিয়ে গেছে। নীচে তাকালাম। উঠোনটা খটখটে। উনুন নেই; ধোঁয়াও নয়। হঠাৎ কি যে হল! নাক টানলাম কিসের গন্ধের জন্যে। তারপর কেমন এক বেদনা যেন বুকে এসে লাগল।

আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলাম। এতদিন ধোঁয়ার চোটে চোখে জল এসেছে, দম বন্ধ হয়েছে। আজ একবিন্দু ধোঁয়া নেই কোথাও, তবু চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। দম যেন আটকে আসছিল।

একটি অমর্ত্য কাহিনী

মাধবীমণ্ডপের সুস্নিগ্ধ ছায়াও ভাল লাগেনি একদিন স্বর্গকন্যা নাগদত্তার; ক্লান্তিহর গন্ধদূর্বার শীতল-কোমল শয্যাও আকর্ষণ করেনি তাকে। বকুল আর বনমল্লিকার মৃদু মধুর সৌরভে ভরা ছিল তার কানন, কিন্তু কি আশ্চর্য, কুসুম-দ্রব সে বাতাসও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে বার বার। কে জানে, কোন্ অজ্ঞাত বেদনায় নাগদত্তার নয়ন আজ অশ্রুসিক্ত, কিসের ব্যর্থতা হাহাকার হাওয়ার মতন বুকভরে ছড়িয়ে পড়েছে! আর বল, এ কোন্ অসহ রিক্ততা পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামা মেঘের মতন আজ তার মনের আকাশ ছেয়ে ব্যাপ্ত, বিক্ষিপ্ত!

প্রিয়পথ-প্রতীক্ষিতা অভিমানিনীর বিরহ ক্লেশ কি এতই তীব্র? অথবা এ ছলনা? শোক আর বৈরাগ্যের একটি নিপুণ মূর্তি রচনা করেছে চতুরা সুকৌশলে। নিষ্ঠুরের মত বঞ্চিত করেছে ধবলগ্রীবার বিমোহন শোভা, খুলে ফেলেছে মণিময় কণ্ঠভূষণ। মৃণালকোমল সুডৌল ভুজলতা কেয়ূর কঙ্কণ বর্জিত। কর্ণমূল কুন্দকলি-হীন; ধুলায় লুটিয়েছে বকুলদামকাঞ্চী। বেণীবন্ধন শিথিল, সন্ধ্যাকাশের নিঃসঙ্গ তারার মত একটি শুধু চন্দনের তিলক ললাটে। অঙ্গে তার শ্বেতবাস, কনকবরণ কঞ্চুলিকা। আবরণ আর আভরণের এত দৈন্যতাও যেন সম্পূর্ণ রিক্ততা আর নিঃসঙ্গতাকে প্রকাশ করতে পারছে না, একটা অভাব থেকে গেছে কোথাও, আর তাই মঞ্জির-মন্দিরাখানি তুলে নিয়েছে নাগদত্তা; বিষণ্ণ একটি সুর ছড়িয়ে দিয়েছে বাতাসে।

সখি সন্দর্শনে আসার পথে সেই সুর শুনেছে সৌরভেরী। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে ক্ষণকালের জন্যে। তারপর আপন মনে নিঃশব্দে হেসেছে; ভেবেছে, বিরহবেদনায় বড়ই অধীর হয়েছে সখী নাগদত্তা।

পরিহাস আর মিষ্টবাক্যের পশরা ওষ্ঠে বয়ে সৌরভেরী এসেছে মাধবীমণ্ডপে। কাছে এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে তার চটুল ওষ্ঠ।

মঞ্জির-মন্দিরাও থেমে গেছে। অর্থশূন্য সজল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থেকেছে নাগদত্তা সৌরভেরীর মুখপানে।

গভীর সহানুভূতিতে সখীর কোমল ভুজলতা দুটি আকর্ষণ করে বলেছে সৌরভেরী, 'এত অধীর কেন সখী? তোমার বল্লভ সুশীল এবং সুজন। তিনি ছলনাপটু নন। যথাসময়ে আসবেন। মনক্লেশ দূর কর।'

তিনি আসবেন! হয়ত আসবেন। তবু একটি দীর্ঘশ্বাস গোপন করা যায় না। বেদনাবিহ্বল কণ্ঠে নাগদত্তা বলে, 'সখি সৌরভি, প্রিয়পথ প্রতীক্ষায় আমি কাতর হইনি। এক অজ্ঞাত আশঙ্কা আমায় বিচলিত করেছে। ওই দেখো সখি, আমার কাননের রক্তাশোক বৃক্ষ তার সমস্ত রক্তিমা হারিয়েছে, নাগকেশরের কুঞ্জ আজ শূন্য, বকুল বনমল্লিকার সুরভিত স্পর্শও আমায় বঞ্চনা করছে।'

সৌরভেরী সচকিত দৃষ্টি মেলে ইতস্তত নিরাক্ষণ করে। লঘু সুরে বলে, 'বিরহের অঞ্জন তোমার নয়নে কালিমা মাখিয়েছে সখি। পুষ্পিত কাননের রূপ বর্ণ গন্ধ সব ত' তেমনই আছে।'

আছে? নাগদত্তা চমকে ওঠে, একটি শিহরণ বয়ে যায় সর্বাঙ্গে। কেঁপে ওঠে সেই কৃশ-করুণ অঙ্গ। দুটি চোখে আরও ঘন হয়ে ওঠে উদ্বেগ, আশঙ্কা। ভীত কণ্ঠে বলে, 'পরিহাস করো না, সখি।'

—পরিহাস নয়।

—তবে ছলনা।

—না, ছলনা নয়।

—অসম্ভব কথা কেন বল, সৌরভি। অশ্রুসলিল আমায় অন্ধ করেনি। আমার কাননের অশোক কিংশুক সত্যই বর্ণহীন, বকুল চম্পক সুরভি বঞ্চিত।

—দেবকন্যা, এ তোমার ভ্রম। তুমি বিস্মৃত হচ্ছ দেবলোক জরা এবং ক্ষয়হীন। স্বর্গকাননের তরু, পুষ্প, পল্লব কখনো জরা দ্বারা পীড়িত হয় না, ক্ষয় তাদের অধিকার করতে পারে না। কি

কারণে তারা তাদের বর্ণ এবং সুরভি হারাবে? অসম্ভব কি সম্ভব হয়, সখি!

না হলেই তৃপ্ত হতে পারত নাগদত্তা, এই মুহূর্তেই। কিন্তু অসম্ভবই যে সম্ভব হতে বসেছে, তাই ত' এ উদ্বেগ। সৌরভেরীর কথায় সে উদ্বেগ আরও তীব্র হল। এবং আরও একটি অনতিক্রমনীয় বিস্ময় তাকে হতবাক্ করলে। না কি, এ সত্যই ভ্রম! অন্ধই হয়েছে নাগদত্তা, পুষ্পিত কাননের রূপবর্ণ আজ আর আলোকে আলোময় হয়ে চোখের ওপর ভেসে উঠছে না, শুধু একটা ছায়া হয়ে আড়ালে সরে রয়েছে। কিন্তু গন্ধ? কোথায় সেই চেতনামদির সুরভি-সুবাস? কেমন করে তা হারিয়ে গেল একটি রাত্রে?

কৃশ শশাঙ্ক বুঝি আরো কৃশতর হল। মলিনতর হল কৌমুদী। আশঙ্কাবিহ্বল কণ্ঠে নাগদত্তা বলে, 'বুঝি অসম্ভবই সম্ভব হতে চলেছে, সৌরভি। ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্নও দেখেছি বিগতরাত্রে।'

দুঃস্বপ্নই দেখেছে নাগদত্তা। সত্যই দুঃস্বপ্ন। নিশিশেষে শিয়রের প্রদীপ নিভেছে। হয়ত হাওয়ায়। শূন্য তার কক্ষ। গন্ধপাত্রের ধূমশিখাগুলিও যেন কখন বিলীন হয়েছে অন্ধকারে, অন্তর্ধ্যান করেছে ব্যাজনরতা সহচরী। গবাক্ষপথে দুটি সতর্ক ছায়া নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। সেই যুগলমূর্তি যেন কৃষ্ণাজিন আর ভস্মে আচ্ছাদিত করেছে তাদের সমগ্র অস্তিত্ব। সে দুটি দেহে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষীণতম স্পন্দনও নেই। শুধু লুব্ধ যুগল দৃষ্টি আলিঙ্গন করছে নাগদত্তাকে।

চমকে উঠে চোখ মেলেছে নাগদত্তা। নিবিড় নিকষ কালো কক্ষকে আরও ভয়াবহ শূন্যতায় নিক্ষেপ করে যুগলমূর্তি অপসৃত হয়েছে। অসহায়, নিস্পন্দ একটি কামিনী বিস্ফারিত দুটি চোখ মেলে শুধু সত্য অসত্যের নিরসন দ্বন্দ্বে কালক্ষয় করেছে।

স্বপ্নবিবরণ বিভ্রান্ত করে সৌরভেরীকেও। এখন মনে হয়, হয়ত এ ভ্রম নয়; সখী নাগদত্তা যথার্থই কোন একটি অশুভকে প্রত্যক্ষ করছেন। কিন্তু কেন? সৌরভেরী বার বার পুষ্পিত তরুশাখার বর্ণসমারোহ নিরীক্ষণ করে আর ফিরে ফিরে দেখে নাগদত্তার

পাণ্ডুর আনন। যেন একটি অজ্ঞেয় রহস্যের অর্থ উদ্ধার করতে চায় ও।

অদূরে অকস্মাৎ মৃদু পত্রঘর্ষণের ধ্বনি ওঠে। চকিত দৃষ্টিপাতে আগন্তুককে প্রত্যক্ষ করে সৌরভেরী আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়।

—সখী, তোমার চিন্তা আমায় ব্যাকুল করছে। জানি না, কোন অশুভ গ্রহ তোমায় স্পর্শ করেছে। গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রসেন আসছেন, তাঁর কাছে সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।

কথা শেষে সৌরভেরী পত্রান্তরালে অদৃশ্য হয়ে যায়—চিত্রসেন মন্থরগতিতে মাধবীমণ্ডপের সামনে এসে দাঁড়ান। ওষ্ঠের সুস্মিত হাসিটুকু তাঁর মুছে যায়; বিস্মিত হন চিত্রসেন। শোকাচ্ছন্ন প্রিয়ার রিক্ততা তাঁকে বিচলিত করে। ব্যথাহত দৃষ্টিতে অপলক নয়নে দীর্ঘক্ষণ তিনি নিরীক্ষণ করেন নাগদত্তাকে। এ নারী যেন তাঁর পরিচিত নয়। এতই পার্থক্য! একটি রাত্রির ব্যবধানে সেই সুউজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি পেলব দেহলতা যেন কোন অভিশাপে দগ্ধতরুর মত হতশ্রী হয়ে গেছে।

নাগদত্তার করুণ, আশঙ্কাবিহ্বল, অশ্রুসিক্ত মুখখানি কতক্ষণ নীরবে অবলোকন করেন চিত্রসেন; বলেন, 'সুতনুকা, তোমার এ রূপ কেন? প্রভাতের হিমাচ্ছন্ন নদীতীরের মত তুমি সজলকৃশ, নিরাভরণ। এ কি কপট অভিমান?'

নাগদত্তা। না দেব। দুর্জ্ঞেয় ভাগ্য আমায় বুঝি কোন অজ্ঞাত অশুভের প্রতি আকর্ষণ করছে। সুরলোকের সকল সুখ থেকে আমি বঞ্চিত।

চিত্রসেন অনুরাগবশে নাগদত্তার বাহুলতা বক্ষে আকর্ষণ করেন। মৃদু-মৃদঙ্গ-ধ্বনির মতন তাঁর সুমিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'অভিমানিনী, স্পর্শ করে দেখ, শত বসন্তের ব্যাকুলতায় তপ্ত এ হৃদয় তোমার প্রেমে ধন্য হতে এসেছে। সুরলোকের সকল সুখের শ্রেষ্ঠ সুখ তো তোমার কৃপা ভিক্ষা করছে। বঞ্চনা কোথায়?'

নাগদত্তা। আমার বাক্যে সন্দেহ করবেন না, প্রভু!

চিত্রসেন। আমার অনুরাগের প্রতি তুমিই বা সন্দিগ্ধ কেন?

নাগদত্তা। মার্জনা করবেন, ধীমান। আপনার অনুরাগ অকৃত্রিম, চন্দ্রকিরণের মত তা স্নিগ্ধ, নির্মল; সে অনুরাগের স্পর্শে মুহূর্তে যুগান্তের বিরহের অবসান হয়। কিন্তু প্রভু, প্রকৃতই আমি সুরলোকের সর্বসুখ থেকে বঞ্চিত।

প্রিয় করস্পর্শ থেকে মুক্ত করে নিতে চায় নিজেকে নাগদত্তা। তার ঈষৎ কম্পিত ওষ্ঠাধর দুটি ক্ষণেক নিস্তব্ধ হয়ে থাকে, দৃষ্টির শূন্যতা নীড়হারা পাখির মত ভেসে বেড়ায়।

চিত্রসেন বিচলিত বোধ করেন। এ কোন্ রহস্যলীলা শুরু করেছে এই নারী!

চিত্রসেন। আমাকে অধীর কর না, সুশ্রোণী। তোমার রহস্যময় বাক্য আমার উদ্বেগ দ্বিগুণ বর্ধিত করেছে। সুরলোকের কোন্ সুখ, আনন্দ থেকে তুমি বঞ্চিত—তা ব্যক্ত কর।

ব্যক্ত করার জন্যই ত এ অপেক্ষা। যে কুহেলিকা একটি মধুপকে সকল রসকুঞ্জ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে—তারই কী কম আক্ষেপ। ·· নাগদত্তা বেতসলতার মতন একবার কেঁপে ওঠে, দুটি বেদনাবিধুর নয়ন আরও গাঢ় হয়ে আসে, ম্লান কণ্ঠ দূরাগত বিষণ্ণ বীণার সুরের মত করুণ। একটি শোকার্ত অস্পষ্ট গীতিরাগিণী যেন ব্যক্ত করে তার অন্তর, মেলে ধরে আপনাকে। সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করে ও বলে, 'বিশ্বাস করুন দেব, এই পুষ্পসমারোহ আমার কাছে অর্থহীন। রক্তবর্ণ কিংশুক আমার নয়নে বিবর্ণ প্রতিভাত হচ্ছে, পীতচম্পকের স্মৃতিবিজড়িত কুঞ্জটির তলায় সকল কুসুম ঝরে গেছে, ওরা রূপহীন, গন্ধহীন। গন্ধদূর্বার পবিত্র অঙ্কে আজ দেখেছি ক'টি কুররীশাবক মাতৃপক্ষপুটের আশ্রয় বঞ্চিত হয়ে পড়ে আছে।'

চিত্রসেন। মদালসা, বিগত রাত্রের মাধ্বীর তীব্র নেশায় তুমি নিশ্চয়ই আচ্ছন্ন রয়েছো।

নাগদত্তা। পরিহাস করবেন না, হৃদয়েশ্বর। গত রাত্রের দুঃস্বপ্নে আমি আচ্ছন্ন একথা সত্য। হয়ত দুর্জ্ঞেয় ভবিষ্যতের একটি ছায়াই ওই স্বপ্ন।

ক্ষণকাল নীরব থেকে নাগদত্তা প্রশ্ন করে, 'আপনি কি কোন বর্ণ প্রত্যক্ষ করছেন এ কাননে?'

চিত্রসেন। সকল বর্ণই আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, সখী।

নাগদত্তা। পুষ্প-সুরভির ঘ্রাণ পাচ্ছেন, সখা?

চিত্রসেন। সুগন্ধি বায়ুতে আমার প্রতি নিশ্বাস পরিশুদ্ধ।

নাগদত্তা। পুষ্পপত্রচ্যুত কোন রিক্ত তরু দেখতে পাচ্ছেন, সুজন?

চিত্রসেন। একটি তরুই শুধু দেখছি, সে তুমি। কী দুঃসহ তোমার বৈরাগ্য!

নাগদত্তা। তবে, সখী যা বলেছে তাই বুঝি সত্য, প্রভু। দেবলোকে আমি জরা এবং ক্ষয় প্রত্যক্ষ করেছি।

সহসা চিত্তে এক ভাবান্তর ঘটে যায় চিত্রসেনের। চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয় না, অপর একটি চিন্তার সঙ্গে একসূত্রে জড়িয়ে যায়। এমনি একটি আশঙ্কার মেঘ তাঁর মনেও উদয় হয়েছে। কিন্তু তিনি জানেন, এ মেঘ বড় ভয়ঙ্কর। সর্বনাশা সেই চিন্তাকে তাই স্বেচ্ছায় দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছেন।

চেয়েছিলেন, কিন্তু পারলেন না। নাগদত্তার কথায় বিস্ময়ের চমক লাগে তাঁর দুই চোখে। মূঢ় নারী, জানে না তার কথার কি অর্থ! একটি কঠিন গাম্ভীর্য নিস্তব্ধ সরোবরের জলরাশির মতন টলমল করতে থাকে তাঁর মুখে। এবং বুঝি সুগভীর বেদনাও।

চিত্রসেন। তোমার বাক্যের গুরুত্ব সম্পর্কে তুমি সচেতন নও, শুচিস্মিতা। জরা ও ক্ষয়—মৃত্যুরই নামান্তর। অমর্ত্য লোকে তুমি মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করছো?

মৃত্যু? অপ্সরী নাগদত্তার সর্বেন্দ্রিয় নিথর হয়ে যায় একটিমাত্র শব্দে। পাংশু মুখ, ভীতবিহ্বল দুই চোখ। ওই একটি শব্দই যেন ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে খান্ খান্ করে ভেঙে নিজেকে বিস্তার করে

চলেছে, আর সেই ধ্বনিকম্পন বিকট বীভৎস অট্টহাসির মতন বাজছে তার কানে। ক্ষণে ক্ষণে শিহরণের ঢেউ লাগে, থর থর করে কাঁপে ওর সর্বাঙ্গ, দ্রুত হয়ে ওঠে শ্বাস প্রশ্বাস। স্পষ্টই অনুভব করে নাগদত্তা, স্বপ্নদৃষ্ট সেই দুই কৃষ্ণচ্ছায়ার অশরীরী আবির্ভাব। যেন এই কাননের ছায়ায়, পাতায়, বাতাসে, তারা মিশে আছে, মিলিয়ে আছে। তীক্ষ্ণ, করুণ, ভীত, আর্তনাদ শোনা যায়। চিত্রসেনের বিস্তীর্ণ বক্ষে নিজেকে গোপন করে শঙ্কিনী।

কিন্তু, কি দুর্দৈব, গন্ধর্ব চিত্রসেনের আলিঙ্গন-আশ্রয়ের নিবিড়তাও আজ বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা হয়ে বাজে সর্বাঙ্গে।

চিত্রসেন বেদনার্ত কণ্ঠে বলেন, 'সখী, যথার্থ ই তুমি ভীত হয়েছ।'

নাগদত্তা। ভয় আমায় অধিকার করেছে, সখা।

চিত্রসেন। এবং মৃত্যু-চিন্তা—

নাগদত্তা। মৃত্যুর দুশ্চিন্তা আমায় তিলে তিলে দগ্ধ করছে।

চিত্রসেনের আলিঙ্গনের মধ্যে একটি নিঃস্বতা হাহাকার করে ওঠে। রোদনোচ্ছাস দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।

চিত্রসেন স্তব্ধ। অমর্ত্যবাসী অপ্সরা দেবলোকে মৃত্যু এবং ভয়কে অনুভব করেছে। পরিণাম—? পরিণাম বড় ভয়ঙ্কর। নাগদত্তা তা হয়ত জানে না। জানবে।

রাত গভীর হয়ে আসে। চিত্রসেন বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হন।

চিত্রসেন। সখী, আমায় বিদায় দাও।

নাগদত্তা। আমায় নিঃসঙ্গ রেখে যাবেন, সখা?

চিত্রসেন। তোমায়ও বিদায় নিতে হবে, নাগদত্তা। তোমার যাত্রাও নিঃসঙ্গ, একাকী।

নাগদত্তা প্রশ্নার্ত চোখ মেলে তাকায়। চিত্রসেন বেদনাসিক্ত কণ্ঠে বলেন, 'জানি না, কোন্ দুষ্কার্যবশে, কোন্ অভিশাপে তোমার এ দণ্ড!'

নাগদত্তা। দণ্ড?

চিত্রসেন। অমোঘ দণ্ডই নেমে এসেছে, সখী। দেবলোকে আর তোমার স্থান নেই। এই অমরা রাজ্য থেকে চিরকালের মত নির্বাসিত হলে তুমি।

নাগদত্তা। নির্বাসন—?

চিত্রসেন। অমর্ত্য রাজ্যে মৃত্যুর স্থান নেই এবং ভয়ের। এরা মর্ত্যলোকে নিজ অধিকার বিস্তার করেছে। মর্ত্যলোকে মৃত্যু গর্ভজাত সন্তানদ্বয়কে তুমি দেখবে হতভাগিনী, তারা নরক এবং যাতনা নামে সুবিদিত।

চিত্রসেন অদম্য একটি দীর্ঘনিশ্বাস বহুকষ্টে গোপন করে উঠে দাঁড়ান।

নাগদত্তা পাষাণের মত স্থির, নিস্পন্দ। দেবলোকের অবশিষ্ট একটি আশীর্বাদ থেকেও যে সে বঞ্চিত হতে চলেছে, এ বোধটুকুও তার চেতনা থেকে নিশ্চিহ্ন।

* * *

নিশিশেষে একটি ম্লান নক্ষত্রের আলোয় নাগদত্তা যেন তার শেষ অশ্রুবিন্দুটুকু চিনতে পেরে চমকে ওঠে। এমনি একটি অশ্রুবিন্দু এখনও বুঝি আর্দ্রতায় কোমল হয়ে মর্ত্যের সেই ছিন্ন মালিকাটির একটি কুসুমকে সজীব করে রেখেছে।

ধীরে ধীরে সকল রহস্য তার অর্থ নিয়ে ফুটে ওঠে নাগদত্তার মানসপটে। মনে পড়ে যায়, মহারাজ কুশনাভকে। মনে পড়ে মর্ত্যলোকের একটি প্রাণীর প্রেম আর ব্যাকুলতা।

দেবলোকবাসিনী অপ্সরী নাগদত্তা দেবকার্যে নিয়োজিত হয়ে মর্ত্যলোকের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল একদা। প্রত্যাবর্তন-পথে আসন্ন বর্ষণস্তব্ধ বনানীর সমারোহ দেখে ক্ষণিক বুঝি থেমেছিল। কেকাস্বরে তখন বনভূমি মুখর, নব কদম্বের হিল্লোল, সবুজের স্নিগ্ধাঞ্জন মেখে তরুলতা সবুজ-সজল। হঠাৎ বুঝি চোখে পড়ল আর একটি নব জলদ। উচ্ছলস্রোতা তটিনীর শিলাসনে সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে মিশে আছে। শুধু মৃদঙ্গধ্বনির মত একটি সুর ধ্বনিত হচ্ছে

বাতাসে। কৌতূহলবশে সতর্ক চরণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নাগদত্তা। পুষ্পস্তবকের অর্ঘ সাজিয়ে সেই নবজলদ শ্যামরূপ কাকে যেন বন্দনা করছে—তার কণ্ঠের সুগম্ভীর শব্দ নদীস্রোতের কল্লোলের সঙ্গে ছন্দে সুরে একাকার।

ধরা পড়ে গিয়েছে নাগদত্তা আকস্মিক ভাবেই। মর্ত্যলোকের বন্দনা-নম্র কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেছে, পুষ্পার্ঘ স্খলিত হয়ে নদীপ্রবাহে ভেসে গেছে।

—বনচারিণী, আপনি কে ?

পরিচয় দেয়নি নাগদত্তা। কেমন এক অজ্ঞাত কৌতূহলবশে ছলনা করেছে মর্ত্যবাসীকে।

—আর্য, আপনি কার বন্দনা করছিলেন ?

—প্রকৃতির।

—প্রকৃতির—?

—হ্যাঁ, শোভনাঙ্গী, প্রকৃতির। ঐ তিমিরাবৃত মেঘ এবং আকাশ, এই শ্যাম-মেখলা আবরিত তরুলতার। পশু, পাখী, পত্র, পল্লব, স্থল, জল—আমি মর্ত্যলোকের বন্দনা করছিলাম।

—আর্য, বিষাদবিষণ্ণ এ প্রকৃতির বন্দনায় কি সুখ ও আনন্দ আছে ?

—কল্যাণী, এর সুখ অপ্রকাশ্য। এর সুখেই কেকা স্বেচ্ছায় হর্ষোৎফুল্ল হয়ে নৃত্য করে, বলাকাদল শূন্য থেকে শূন্যে ভেসে যায়, কদম্বকেশর, যূথী, যাতি থেকে থেকে ফুটে ওঠে, বনানী বিধুরা হয়, স্রোতস্বিনী কিঙ্কিনী বাজিয়ে ছুটে চলে। রূপ বিষাদ বলেই ত বিরহের নিবিড়তায় এই ঋতু এত মধুর।

মধুর ? সত্যই মধুর। দেবলোকবাসিনী নাগদত্তা মর্ত্যলোকের আসন্ন বর্ষার মেঘভারে একটি অনন্ত বিরহের আশ্চর্য নিবিড় সুখকে যেন অনুভব করছে এবং বিস্মৃত হয়েছে অমর্ত্যলোক।

তারপর ? তারপর সেই জলধারায় মহারাজ কুশনাভের হাত ধরে চঞ্চলা লীলামত্ত হয়ে উঠেছে। সবুজ দূর্বাদল পীড়িত করে ছুটে চলে

গেছে ওরা, তমাল তলায় অসম্বৃত বসন বর্জন করে বল্কল পরিধান করেছে, গলায় দুলিয়েছে কনকচাঁপার মালা, কুন্তলে তার কুশনাভ একটি শ্বেতকমলের অর্ধস্ফুট কুঁড়ি দিয়েছেন গুঁজে, রক্তজবায় বাহুমূল অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠেছে।

চঞ্চল দুটি মৃগ কখন যে লীলাশেষে পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন হয়ে চুম্বনে আলিঙ্গনে একটি একাত্ম সুখক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ জানে না।

ঘুম যখন ভাঙল, আকাশভরা নীলের কোলে চাঁদ ফুটে উঠেছে। বনভূভাগ তিমিরাবৃত। একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র যেন মর্ত্যলোকের ওপার থেকে হাতছানি দিচ্ছে নাগদত্তাকে।

কুশনাভ ওর দুটি হাত ধরে ফেলেছিলেন।

—প্রাসাদে চল, তোমায় আমি ধর্মাচরণ দ্বারা বধূ হিসেবে বরণ করে নেব, প্রিয়া। ইহজীবন একটি নিশ্চিন্ত ভালবাসা দিয়ে তোমায় পূর্ণ করব।

নাগদত্তা হেসে ওঠে, 'তা হয় না মহারাজ।'

—কেন?

এ কেনর কোন উত্তর নেই। দেবলোকের কন্যা মর্ত্যলোকের বধূ হবে? ইহজীবনের ভালবাসা? তার পরিধি আর কতটুকু—একটি আয়ুতেই তার হিসাব-নিকাশ।

—মহারাজ, আমায় মার্জনা করুন। এ মর্ত্যলোক হয়ত সুন্দর, কিন্তু তা ক্ষণকালের সৌন্দর্য। এখানে অনন্ত হয়ে থাকে শুধু রোদন, বেদনা, যাতনা, শোক।

—নিষ্ঠুরা, প্রেম কি অনন্ত নয়?

—আয়ু যদি মুছে যায়, তবে কোন অনন্ত অবশিষ্ট থাকে, মহারাজ!

মহারাজ কুশনাভ হাহাকার করে উঠেছিলেন—তাঁর সবল দুই বাহুতে একটি ছলনা এবং মোহকে উদ্ধতাবশে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন অনন্তকালের জন্যে। পদ্মপত্রের জলবিন্দুর সেই সৌরস্বপ্ন বিস্মিত করছে অমর্ত্যবাসিনীকে।

কিন্তু অবসর ছিল না স্বর্গবনিতা নাগদত্তার মর্ত্যলোকের একটি বিরহী হৃদয়ের হাহাকার শোনার।

মহারাজ কুশনাভকে আজ মনে পড়েছে নাগদত্তার। আর মনে পড়েছে সেই আসন্ন বর্ষণস্তব্ধ মর্ত্যলোকের বনভূমি। কেকাস্বরে যা মুখর, নব কদম্বের হিল্লোলে, সবুজের মেখলায়, স্রোতস্বিনীর উপলাঘাত-ছন্দে বিষণ্ণমধুর। আর মনে পড়েছে সেই কথা—!

মনে পড়ছে, কিন্তু আর যেন বিরাগ নেই মর্ত্যলোকের প্রতি। শত রোদন, বেদনা, যাতনার মধ্যেও সেই মর্ত্যলোকেই একটি হাহাকার শুধু আর্তনাদ করে বলতে পারে, 'নিষ্ঠুর, প্রেম কি অনন্ত নয়?' দেবলোকের কোন গন্ধর্ব এমন ভয়ঙ্কর অথচ বড় মধুর এই আর্তনাদটি করতে জানে না। মোহবশেও একটি ক্ষণিক সুখকে সবল বাহুতে আঁকড়ে ধরে রাখার জন্যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না। ক্ষণিকের জন্যে পায় বলেই মর্ত্যে হাহাকার আর অশ্রু আছে, একটি পলকের জন্য চাওয়া বলেই ওদের খড়্গ সহজে জ্বলে ওঠে, মৃত্যু আছে বলেই মদিরতা আর সর্বনাশা প্রেম। এবং বিরহ। আর ব্যর্থতা, শোক, দুঃখ, যাতনা, হিংসা। নরক আর নন্দনকানন।

নাগদত্তা স্খলিত চরণে মাধবীমণ্ডপ ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। নিশিভোরের প্রশান্তি তখন তার মনে। মর্ত্যের একটি ছায়া নেমে এসেছে—আর কোন উদ্বেগ নেই। কোন আশঙ্কাও।

তুলো-মন পাখি

সব গল্পই মালা গাঁথার গল্প নয় যে, তার সুরু আছে আর শেষ আছে, উপসংহারে গোড়ার সুতো আর আগার সুতোয় একটা ফাঁস দিয়ে দিলেই গোল হয়ে শেষ হবে। জীবনের বেশির ভাগ গল্পই অমন গোল করে শেষ হয় না। সব মালাই কি আর গাঁথা শেষ হয়! কোথাও সুতো ছিঁড়ে যায়, কোথাও ফুল ফুরিয়ে যায়; কখনো বা ছুঁচ ফুটে যায় আঙ্গুলে। প্রভাত লতিকার গল্পও শেষ হয় নি।

ওদের গল্প আর পাঁচটা গল্পের মতই শুরু হয়েছিল। সচরাচর যা হয় সেই বিশ বাইশ বছরের ছেলে আর সতেরো আঠারো বছরের মেয়ে প্রথমে দূরে দূরে থেকে, তারপর সামান্য কাছাকাছি এসে অনেক কীজানি এবং হয়তোর সংকোচ কাটিয়ে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে এসেছিল। অন্তত সাধারণ ভাবে একে ধরা ছোঁয়াই বলে। কেননা লতিকা তার কথা আর লুকিয়ে রাখেনি মুখে বলেছিল—চিঠিতে লিখেছিল; আর প্রভাত তার মনের দরজাটা হাঠ করে খুলে দিয়েছিল। সেই সব এলোমেলো কথা আর চিঠির বাহুল্য ধীরে ধীরে আরো বেড়েছিল। যদি বৃষ্টির তুলনাটা অচল না হয় তবে বলা চলে, সকালের ঝিরিঝিরি বৃষ্টি দুপুরে এসে গাঢ় হয়েছিল, আকাশে এত মেঘ ছিল-মনে হয় নি কোনোদিন এ মেঘ কাটবে, বারি ঝর ঝর সেই অদ্ভুত কলরব মনে হয় নি কোনোদিন থেমে যাবে। ওরা—ওরা দু'জন—প্রভাত আর লতিকা-সেই আকাশ, বাতাস এবং নিজেদের দিকে তাকিয়ে সেই সুন্দর সন্ধ্যার জন্যে অপেক্ষা করেছিল। যখন বাইরের বাতাস আরও উদ্দাম হবে, আকাশ আরো কালো, বৃষ্টির জল ঝরে যাবে একটানা সবকিছুকে আড়াল করে—সবকিছুকে দূরে সরিয়ে—শুধু দুটি মানুষ একটু আলো, আর একটি ঘরে আরও নিবিড় হয়ে উঠতে পারবে তারা।

প্রভাত সত্যি সত্যিই বলেছিল, এর বেশি সে চায় না। লতিকা প্রভাতের হাত ধরে বাস্তবিকই কাঁপা গলায় জবাব দিয়েছিল, এর চেয়ে বড় সুখ, বেশি সুখের স্বপ্নও সে দেখে না।

প্রভাতের ভয় তবুও যায় নি। পরিষ্কার করে সব বুঝিয়ে দিয়েছিল লতিকাকে। বলেছিল, আমার ভয় হয়, এতো কষ্ট কি আর তুমি সইতে পারবে ?

'সময় হলে দেখ আমি কী পারি আর না পারি। তোমার জন্যে, আমি সব পারি। গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারি তোমার হাত ধরে।'

প্রভাত অবিশ্বাস করেনি লতিকার কথা। অবিশ্বাসের কিছু ছিল না। ভালবাসার আগুন যে কত উজ্জ্বল, কত শুদ্ধ, কত তীব্র—তার কথা ওর জানা ছিল। লতিকা সব পারবে, আরও বেশি বরং পারবে —কথাটা ভেবেছিল প্রভাত এবং ভাবতে গিয়ে বুকের মধ্যে একটা বড় সুন্দর আঁচ লেগে সারাটা বুকই উষ্ণ হয়ে উঠেছিল।

লতিকা বলেছিল, সময় আসলে সে কী পারে আর না-পারে তার প্রমাণ দেবে। হ্যাঁ, লতিকা তার কথা রেখেছিল। সময়টা অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি এল না। আরও গোটা তিনেক বছর লাগল। তারপর খুব ভাল সময়ে, যখন আকাশে হিমজড়ানো চাঁদ, মাঠ আর ঘাস পাথরে নুড়িতে গাছের ম্লান ছায়া জড়িয়ে রয়েছে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, পুবের হাওয়ায় শিউলির গন্ধ—তখন লতিকা সেই সময়কে স্পষ্ট করে কাছে দেখতে পেল। এর চেয়ে ভাল সময় আর কি হতে পারে—! লতিকা অন্য মানুষের হাত ধরে ফেলল।

খুবই আকস্মিক ঘটনা। প্রভাত এটা আশা করেনি। যদিও ইদানীং তার মনে একটা অসহায়তা জেগেছিলো। অন্য একটা ভয়ানক 'হয়ত' তাকে দিন-দুপুর, রাত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছিল। প্রভাত সে কথা কাউকে মুখফুটে বলতে পারত না। নিজের কাছে—নিজের মনের কাছে লতিকাকে দাঁড় করিয়ে বলত : এ-সবের কোন দরকার ছিল না, লতিকা ; মনের ঘরে তালা দেওয়া যায় না। তুমি এ-খেলা

ভাঙতে চাও ভাঙো কিন্তু স্পষ্ট করে বলো। লুকোচুরি ক'রো না। সম্পর্কটাকে কদর্য করো না।

প্রভাত আগাগোড়াই ভালোবাসার নীতিতত্ত্ব আর সৌন্দর্যতত্ত্বের সঙ্গে শান্তিজল ছিটিয়ে নানান রকম সুন্দর কথা ললিতার মগজে ঢোকাবার চেষ্টা করেছে। এটা সে পছন্দ করত, ভালবাসত এবং এই সব কেতাবী কথা সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করত। যাকে ভালবাসব তাকে যখন আর ভালবাসতে পারব না—তখন এই দুঃসহ কথাটাও সহজ করে, স্পষ্ট করে বলব—এও একটা সেই কেতাবী কথা।

কথাটা ভাল, কিন্তু কাজের কথা নয়। লতিকা বার বার তেমন প্রমাণ দিচ্ছিল। তবু প্রভাত ভালবাসার এই মরাল্ নিয়ে শেষ পর্যন্ত কুটো আশ্রয় করেও সাগর পাড়ি দিচ্ছিল। শেষে দেখল ভালবাসায় নীতি কথাটাই সবচেয়ে অচল। নীতি মানলে নীতিবাগীশ হতে হয়। নীতি মেনে কেউ কি ভাল বেসেছে ?

লতিকা বুদ্ধিমতী মেয়ে। সংসার তাকে যে সব জ্ঞান দিচ্ছিল তাতে ভাল মন্দ, উচিত অনুচিতের ব্যাপারটা সে ভালো করে শিখে নিচ্ছিল। নীতির বাই নিয়ে বসে থাকলে কপালে যে অশেষ দুঃখ আছে লতিকা অনেক আগেই সেটা ধরতে পেরেছিলো। আর দুঃখকে লতিকা পছন্দ করত না। দুঃখের ওপর তার এক বিন্দুও মোহ ছিল না। গল্পের দুঃখ সওয়া যায় কেননা সেটা নিজের নয়, নিজের দুঃখ সওয়া যায় না।

যদিও প্রভাতকে মুখে বলেনি, তবু লতিকা মনে মনে কথাটা বলেছিল ঃ আশ্চর্য, কি বলেছি না-বলেছি একদিন এখন কি আমায় সেই ফর্দ মিলিয়ে হিসেব দিতে হবে। মানুষ অমন অনেক কিছু বলে থাকে মুখে। তা বলে সত্যিই আর তা করে না।

প্রভাত-লতিকার গল্প এই ভাবে শেষ হয়েছিল ছ'বছর আগে।

কিন্তু এই শেষ যে সত্যিকারের শেষ নয়—আরও খানিকটা আড়ালে থেকে গেছে সেটা জানা গেল দু'বছর পরে। প্রভাতের সঙ্গে লতিকার আবার যখন দেখা হল।

কোথায় দেখা হল, কেমন করে কি ভাবে—সে-সব আমার বক্তব্য নয়। নায়ক-নায়িকার দেখা হবার জায়গার কি অভাব আছে—? পথ-ঘাট, পার্ক-সিনেমা, চায়ের দোকান, রেল-কামরা, ওয়েটিংরুম—কতোই তো জায়গা আছে। ধরে নেওয়া যাক, এরই কোন এক জায়গায় প্রভাতের সঙ্গে লতিকার দেখা হয়েছিল।

সামনাসামনি দেখা হবার পর সাধারণত যা হয় এসব ক্ষেত্রে, থমকে দাঁড়ায় দুজনে, পলকের জন্যে এ ওর চোখের দিকে চায়, তারপর পাশ কাটিয়ে চলে যায় ভয়ংকর অস্বস্তিটুকু এড়াবার জন্যে—প্রভাত-লতিকার বেলাও তাই ঘটতে যাচ্ছিল। প্রভাত লতিকাকে এবং লতিকা প্রভাতের পাশ কাটাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পারল না।

গল্পের জন্যেই কিনা জানি না, এখানে অদৃশ্য হাতে কারুর একটু কারিকুরী ঘটল। যার ফলে প্রভাতের জুতোর আগায় লতিকার পায়ের পাতা পর্যন্ত নামানা শাড়ীর একটা জায়গা আটকে গেল। বাস থেকে নামতে গিয়ে নামতে পারল না লতিকা। প্রভাতও ব্যাপারটা যখন বুঝতে পারল তখন বাসটা ষ্টপেজ ছেড়ে দিয়েছে।

অসঙ্কোচে পা সরিয়ে প্রভাত লতিকার দিকে একবার চাইল। এ-দিক ও-দিকও তাকাল। কয়েকটা চোখ দৃশ্যটা পরিপাটি করে দেখে নিয়েছে। গলায় কাশি তুলে এক ছোকরা পাশের বন্ধুকে হেসে বললে, কায়দাটা বেশ ভালোই। শিখে রাখ অমূল্য। কাজ দেবে।

কনডাক্টর পর্যন্ত বলে বসল, নামবার সময় একটু লোকজন দেখে নামবেন দাদা। বলেই লতিকার দিকে তাকাল, দাঁড়ান গাড়ী বেঁধে দিচ্ছি, এইটুকু পেরিয়ে যাক্—এখানে বড্ড ভিড়।

বাস থামলে লতিকা নামল। প্রভাতও। লজ্জায় প্রভাতের মুখ কান চোখ গরম হয়ে গিয়েছিল। বাসের লোক যা ভাবল, তা তো ভাবলই ; লতিকাও কি ভাবল, ইচ্ছে করে জুতোর আগায় ওর শাড়ি চেপে ধরেছিল প্রভাত ! ছি, ছি !

ভাল করে কিছু ভাববার আগেই মুখ থেকে ডাকটা বেরিয়ে গেল, 'লতিকা'।

লতিকা দাঁড়াল। তাকাল।

প্রভাতের যত অস্বস্তি, তত বিমূঢ়তা। কি যে বলবে বুঝতে পারছিল না। কোন রকমে বললে, 'আমি কিন্তু সত্যিই ইচ্ছে করে তোমার শাড়ি চেপে ধরিনি।' বলে প্রভাত একবার লতিকার পায়ের দিকে চাইল, 'তোমার শাড়িটা নষ্ট হল।'

লতিকা হাতের বইগুলো আরো একটু উঁচু করে বুকের ওপর ধরল। একটু যেন হাসল, 'এই কথা বলার জন্যে তুমি বাস থেকে নামলে?'

সত্যিই তো প্রভাত বাস থেকে নামলো কেন? তার এখানে নামবার কথা নয়। কেন নামল প্রভাত! কথাটা ভাবতে গিয়ে খুবই অপ্রস্তুতে পড়ল ও।

কথাটার আর কোনো জবাব দিল না প্রভাত। শুধোলো, 'তুমি এ-দিকে কোথায় যাচ্ছ?'

'বাড়ি।'

'এ-দিকেই তোমার বাড়ি নাকি! কি আশ্চর্য ; আমি তো প্রায়ই আসি এ-দিকে—কই কোনদিন তো তোমায় দেখিনি। কোথায় থাক তোমরা, কোন্ রাস্তায়?'

লতিকা হাঁটতে সুরু করেছিল। বাড়ির ঠিকানাটা বললো না লতিকা, রাস্তার নামটা শুধু বললে। শেষে যোগ করল, 'আমি এদিকে তোমায় বার দুয়েক দেখেছি।'

'না কি! তা দেখতে পার। আমি আসি মাঝে মাঝে এ-দিকে। আমার এক বন্ধু থাকে তোমাদের পাড়ার কাছেই।'

একটু এগিয়ে এসে লতিকা বললে, 'তোমার বাড়ির খবর কি? ভাল আছে সকলে?'

'ভালোই।' মাথা নাড়ল প্রভাত, 'তোমাদের বাড়ীর সব কেমন—?'

'এক রকম।' লতিকা আঁচলটা একটু ঠিক করে নিল। 'মা প্রায়ই তোমার কথা বলেন।'

'আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়।' প্রভাত কি যেন ভাবতে ভাবতে জবাব দিল, 'একদিন সুবিধে করে যাব।'

খানিকটা চুপচাপ। পাশাপাশি হাঁটছে দু-জনে। মনোহারী দোকানটার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে লতিকা একটু দাঁড়ালো। 'আমি একটু, দোকানটায় যাব।'

'কি কিনবে, খাতা ?'

মাথা নাড়ল লতিকা। 'হ্যাঁ, খাতা।' একটু হাসল, 'আসবে নাকি আমার সঙ্গে।'

'চলো।' প্রভাতই আগে পা বাড়াল।

দোকানে ঢুকে কাউণ্টারটার গায়ে প্রায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল প্রভাত। একটু তফাতে লতিকা।

খাতাই শুধু নয়, আরও কটা টুকিটাকি জিনিস কিনল লতিকা। ফিরতি খুচরো পয়সাটা আর ফেরৎ নিল না, পিপারমেণ্ট দেওয়া লজেন্স নিল।

রাস্তায় নেমে লজেন্সের ঠোঁঙা থেকে গোটাকয়েক নিয়ে মুঠোটা প্রভাতের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'খাও ক-টা লজেন্সই খাও।' হাসল লতিকা।

প্রভাত হাত বাড়িয়ে নিল। হেসে বললে, 'বয়সটা কি আর লজেন্স খাওয়ার মতন আছে। দাও, দিচ্ছ যখন।'

পিপারমেণ্টের স্বাদটা জিবে লাগতেই প্রভাত বললে, 'এক সময় এই পিপারমেণ্ট লজেন্স কী ভীষণই না খেতাম আমরা। মনে আছে তোমার ?'

চট্ করে কোনো জবাব দিল না লতিকা। মনে না থাকলে সে আর পিপারমেণ্ট লজেন্স কিনবে কেন। আসলে এই পিপারমেণ্ট লজেন্স খাওয়ানোর বাতিকটা লতিকাই জুগিয়েছিল। প্রভাত সেই বয়সেই বেশি সিগারেট খেত। লতিকা মানা করত। মাথার দিব্যি দিত। প্রভাত বলত, 'আচ্ছা দাঁড়াও, আগামী সোমবার থেকে ছেড়ে দেব—মাস পয়লা থেকে।' কিন্তু ছাড়ত না। সিগারেট কম খাওয়ার বিকল্প দাঁড়িয়েছিল পিপারমেণ্ট লজেন্স !

কথাটা লতিকার মনে পড়েছিল আগে। প্রভাতেরও মনে পড়ল। কিন্তু এ কথাটা আর উচ্চবাচ্য কেউ করল না।

দু'চার পা এগিয়ে এসে লতিকা সুধোল, 'তোমার শরীর কেমন আছে আজকাল ?'

'ওই আছে এক রকম। ভাল মন্দ মিশিয়ে।' হাঁটতে হাঁটতে প্রভাত রাধাচূড়া গাছের ডাল টপকে আসা এক ঝলক বিকেলের আলো দেখতে লাগল। একটা রিক্সা চলে গেল পাশ দিয়ে। পাড়ার গলির মুখে পায়ে নূপুর বেঁধে ঝুমুর ঝুমুর শব্দ তুলে বারোভাজা বেচা লোকটা আসছিল।

বিকেলের মুহূর্তটা কেমন যেন বিষণ্ণ অথচ সুন্দর দেখাচ্ছিল। প্রভাত লতিকার মুখের দিকে চাইল একটু। এই মুখের কোন বদল হয়নি। তেমনি। ফরসা, প্রায়-গোল, ছোট কপাল, খুব হাল্কা চোখ, চাপা নাক, ভীষণ পাতলা দুটি ঠোঁট। লতিকার মুখে এখনও বয়সের ছাপ পড়েনি। পড়া উচিত ছিল। শরীরটা অবশ্য ভালোই হয়েছে আগের চেয়ে।

প্রভাত এবার একটা সিগারেট ধরাল। হেসে বলল, 'যদি রাগ না করো একটা কথা বলি।'

'বলো।'

'তুমি কি পড়াশোনা করছ ?'

মাথা নাড়ল লতিকা। বললে 'আর কিছু করার না পেয়ে—।'

'ভালোই করছ।' লতিকার কথায় বাধা দিয়ে প্রভাত তাড়াতাড়ি বললে।

মেয়েদের স্কুল বাড়িটার কাছে চলে এসেছিল দু-জনে। লতিকা এখানে থামল, প্রভাতও।

একটু চুপচাপ থেকে লতিকা বললে, 'আমি এই কাছেই আমার বন্ধুর বাড়ি যাব। দরকার আছে একটু। সেখান থেকে ঘুরে বাড়ি।'

প্রভাত বুঝতে পারল। বুঝতে পারল—এবার লতিকা তার কাছ থেকে বিদায় নিতে চায়। এমন কিছু নয়, তবু খারাপই লাগল প্রভাতের। মনে হল লতিকা যেন বলছে, এভাবে আমার পিছু নিয়ে আর কতদূর যাবে। তুমি যাও, আমায় একা যেতে দাও।

লতিকার মুখের দিকে একবার তাকাল প্রভাত। চোখ দুটো যেন খুব স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে না লতিকাকে। যেন লতিকা দূরের মানুষ, তার আভাষটা আছে অবয়বটা সুস্পষ্ট নয়।

দীর্ঘনিশ্বাসটা বুকে চেপে রেখে প্রভাত একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'হ্যাঁ, অনেকটা এলাম তোমার সঙ্গে, মনেই হল না যে এতোটা একসঙ্গে এসেছি। আচ্ছা আমি যাই।' কথা শেষ করে প্রভাত আরও একবার লতিকার সেই উদাস চোখ দেখল, সেই সুন্দর চুল। সেই সোনালা চশমা।

প্রভাত চলে গেল, লতিকা আর ভাবল না। প্রভাতও ফিরে আর চাইল না। যদিও যেতে যেতে প্রভাতের মনে হচ্ছিল লতিকা এখুনি তাকে ডাকতে পারে, ইচ্ছে করলেই। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেও ইচ্ছে করছিল খুব—তবু কিসের যেন একটা অহংকার তাকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে দিলে না যে, লতিকা কোথায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে —না চলে গেছে।

মনটা কোথা থেকে কোথায় যেন চলে গেল। কিছু আর ভাল লাগছিল না। এই বিকেল-শেষ আলো, রাস্তা, মানুষ, জন— কোনটাই আর চোখে পড়ছিল না প্রভাতের। সবই যেন তার থেকে বিচ্ছিন্ন। একটি সুন্দর মেয়ে চলে গেল, একটা সাইকেল ফুটপাতে ধাক্কা খেয়ে পড়ল, ট্যাক্সি চলে গেল, স্কুলের ক-টা ছেলে।

প্রভাত কিছুই দেখল না। লতিকা তার চোখের সামনে এখনও যেন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

হাঁটতে হাঁটতে পার্কটার কাছে এসে পড়েছিল প্রভাত। সাবুগাছ আর জামরুল গাছের মাথার ওপর পাখা ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। সাঁতার কাটা পুকুরটা টলটল করছে জলে। পার্কে আস্তে আস্তে ভিড় জমছে। কতকগুলো বাচ্চা ছুটোছুটি করতে করতে গায়ে এসে পড়ল।

প্রভাতের ইচ্ছা হচ্ছিল পার্কের ঘাসে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। নিজেকে বড় ক্লান্ত আর অবসন্ন মনে হচ্ছিল তার।

গোল করে ঘের দেওয়া ফুল আর পাতাবাহারের ঝোপটার পাশে এসে বসল প্রভাত, ঘাসের ওপর। হাত পিছু করে এলিয়ে। একটা সিগারেট ধরাল।

প্রভাত ভাবছিল লতিকা এতক্ষণ তার বন্ধুর বাড়ি গিয়ে কি করছে! হয়ত গল্প করছে, হয়ত হাসছে। প্রভাতের কথা ভাবছে? কে জানে হয়ত এই পথে দেখা হওয়ার আয়ুটুকু পথেই ফুরিয়ে গেছে।

নিজের ওপরই মাঝে মাঝে রাগ হয় প্রভাতের। এই জের টানা মন খারাপের কি অর্থ? প্রভাত কেন পারে না লতিকা যা পারে। লতিকা কতো সহজে সমস্ত কিছু ভুলতে পারল! কতো সহজে আজ এই দেখা হয়ে যাওয়াটুকু যে সইয়ে নিতে পারলে, যেন কিছু হয়নি। চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে কোথায় যাচ্ছ, কেমন আছ, বাড়ির খবর কি—ব্যাস এইটুকুতেই চুকে গেল। তারপর তুমি তোমার রাস্তা ধর—আমি ধরি আমার রাস্তা।

প্রভাত ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনে করবার চেষ্টা করল এমন কোন কথা, কোন ব্যবহার কি প্রকাশ পেয়েছে লতিকার যাতে মনে করা চলে এই সাক্ষাতে সে খুশী হয়েছে! না, তেমন কিছু তো মনে হল না বরং মনে হল, ঘটনাচক্রে দেখা হওয়াটায় সে বিব্রত বোধ করেছে।

কিন্তু লতিকার এখনও কিছু কিছু কথা মনে আছে। প্রভাত যেন নিজেকে খানিকটা সান্ত্বনা দিল। আজও লতিকা পিপারমেণ্টের কথা ভোলেনি।

না, এ-সব বাস্তবিকই আর মনে রাখার মতন কথা নয়। তোমার শরীর কেমন, বাড়ির খবর কি—এমন কুশল প্রশ্ন সবাই করে, চোখের চেনা মানুষও।

প্রভাত বুঝতে পারছিল, লতিকার কাছ থেকে সে যেন আরও অনেক বেশী চেয়েছিল। কি চেয়েছিল তা জানে না। তবু মনে হল, আরও কথা, সঙ্গ, সাহচর্য এবং পুরনো দিনের রোমন্থন—এ-সবই যেন সে চেয়েছিল।

দুঃখ হচ্ছিল প্রভাতের। দুঃখ হচ্ছিল, লতিকার এই দূর দূর ভাব দেখে। সাধারণ ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত সে দেখাল না। সত্যিই কি প্রভাত তার বাড়ি গিয়ে উঠত—না সত্যিকার বাড়িটা চিনে রাখলে রোজ রোজ সেখানে গিয়ে কাঁদুনী গাইত। কিছুই করত না প্রভাত। কিন্তু কি সাবধানী মেয়ে লতিকা, বাড়ির নম্বরটা বললে না। একবারও এমন আভাষ দিল না, যাতে ওদের বাড়ি যাবার কথাটা পর্যন্ত তুলতে পারে প্রভাত।

বিকেল কখন শেষ হয়ে সন্ধ্যা হয়ে এল। গ্যাসপোষ্ট জ্বলল; তারা উঠল আকাশে। পাখিরা শান্ত হল। পার্কের ভিড় কমল একটু।

প্রভাত উঠবো উঠবো করছিল। আর একটা সিগারেট শেষ করে উঠে পড়ল।

খানিকটা হেঁটে আসতেই হঠাৎ মুখোমুখি। লতিকা। লতিকার হাতে তেমনি বই আর টুকিটাকি জিনিষগুলি এখনও রয়েছে।

প্রভাত অবাক হয়ে বললে, 'একি, তুমি বাড়ি যাও নি!'

লতিকা অপ্রস্তুত হল হয়ত, কিন্তু কেমন একটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'তুমি এখনও এখানে কি করছো?'

'কিছু না, এই এমনি। একটু বসেছিলাম।' প্রভাত ম্লান মুখে হাসল।

'চলো আর একটু বসবে।' লতিকা বলল।

যেখানে আগে বসেছিল প্রভাত—সেখানে ফিরে এসে বসল আবার, পাশে লতিকা।

সন্ধ্যে গাঢ় হল! হাওয়া বয়ে গেল ফুর ফুর করে। ভিড় আরও কমে এল। তবু কেউ কোন কথা বলতে পারল না। লতিকা আকাশের তারা দেখল বহুক্ষণ ধরে, আর প্রভাত লতিকার শাড়ির পাশে ঘাসের অন্ধকার। যেন লতিকা ঐ ঘাস আর অন্ধকারের তার সমস্ত কথা লিখে রেখেছে।

'কটা বাজল?' লতিকা হঠাৎ প্রশ্ন করলে ভীষণ বাজে গলায়।

দেশালাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ঘড়িটা দেখল প্রভাত। 'পৌনে আট।'

'চলো উঠি।' লতিকা উঠে দাঁড়াল, প্রভাতও।

পার্কের গেটের কাছাকাছি এসে প্রভাত বললে, 'তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই ?'

মাথা নাড়ল লতিকা। 'না আমি একাই চলে যেতে পারব।'

রাস্তায় এসে দুজনে দু'পথ ধরল। প্রভাত আর লতিকা।

প্রভাত-লতিকার গল্পের এই শেষটুকু খুবই কাঁচা। এর সাজসজ্জা নেই, রঙ নেই, আবেগ নেই-কিছু নেই। মন এতে ভরবে না। প্রভাত-লতিকার মনও ভরে নি। কিন্তু জীবন এমনি। তার গল্প কলমের গল্প নয়।

থাম

শেষ পর্যন্ত বিরক্ত এবং হতাশ হয়েই বোধ হয় মানুষটা থেমে গেছে। সদরে আর কড়া নাড়ার সেই দ্রুত একঘেয়ে শব্দটা শোনা যাচ্ছে না। সাড়াশব্দ না পেয়ে হয়তো সদর থেকেই ফিরে গেল। না কি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে ?

এখনও অন্তত মিনিট পাঁচেক দেরি হবে। তার আগে যমুনা যেতে পারছে না। এই তো সবে সায়াটা পরল। এখনও ভিতর জামা আর ব্লাউজ, তারপর শাড়িটা গায়ে জড়ানোর রয়েছে। মুখ-টুখগুলো একটু না মুছে হুট্-হাট যায় কি ক'রে যমুনা !

বাইরে কে কড়া নাড়ছে, যমুনা গা ধুতে ধুতে অনুমান করবার চেষ্টা করেছিল। কোন সাড়াশব্দ সে দেয় নি ; চুপি চুপি গিয়ে যে খিল-দেওয়া দরজার এ-পাশে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় কিছু বলবে তাও না। যমুনা এ-সব পারে না। কেই বা পারে ? গা ধুতে বসে তো আর শাড়ি সায়া সামলে হুট্ ক'রে সদরে এসে খিল খুলে দেওয়া যায় না ! সাড়া দেওয়াও নয়। কে জানে কে এসেছে, কি দরকার—? একটা জবাব দিয়ে নিস্তার পাওয়ার বদলে পাঁচটা জবাব দিতে হবে। একটু দাঁড়াও। কিংবা খানিক দেরি হবে। কেন ? কেননা এখন আমি গা ধুচ্ছি। না, না—সেটা আরও বিশ্রী। অন্তত যমুনার কাছে। তা ছাড়া যমুনার স্বভাবই এই, আমার ঘরে আমি যা করছি, নিশ্চিন্তে করব ; কারও কাছে তার জবাবদিহি করতে যাব না।

কে এসেছে যমুনা গা ধুতে ধুতে অনুমান করবার চেষ্টা ক'রেও কিছু ঠাওর করতে পারে নি। তবে মণিমোহন নয়। মণিমোহনের কড়া নাড়ার ধরনটা আলাদা। খুব নিশ্চিন্তে, লোহার কড়াটা কাঠের সঙ্গে ঠুকে ঠুকে তাল দিয়ে দিয়ে যেন শব্দ করে। সে-শব্দ যমুনার

এত বেশি চেনা যে, মাঝরাতে আচমকা ঘুম ভেঙেও যদি সদরে শব্দটা শোনে, বলে দিতে পারবে, মণিমোহন এসেছে।

মণিমোহন নয়। ঝি সুখদা? না, ঝি সুখদার আবার অন্য ধরন। কড়াটা একবার নাড়ল কি নাড়ল না, সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে দরজা ধাক্কা দিতে শুরু করবে। আর সুখদা ঝি-ই বা হবে কেন? কাজের পাট চুকিয়ে সে কখন চলে গেছে। ভর সন্ধ্যেতে তার ফিরে আসার কোন কারণ নেই।

অন্য কে হতে পারে? উমা, শৈব, কমলাদি? না, এদের কড়া নাড়ার ধরনটা অন্য রকম। তা ছাড়া সন্ধ্যের মুখে সংসারের কাজকর্ম ছেড়ে তাদের আসার সময় নেই। যদিও আসে, ওরা বোবা নয়। দু-একবার কড়া নেড়েই ডাক দেবে। তাই দেয়।

তবে?

ভাবতে ভাবতে শাড়িটা পরা হয়ে গেল যমুনার। দেড়-হাতি রঙিন টাওয়েল দিয়ে মুখ, গলা মুছে নিল। টেবিলের ওপর পৌনে এক ফুট লম্বা কেরোসিন তেলের টেব্‌ল-ল্যাম্পটা জ্বলছিল। আরও একটু বাড়িয়ে দিল শিখাটা যমুনা। আয়নায় মুখটা একবার দেখে নিল। তারপর বারান্দায়।

কেরোসিন তেলের হাত করতে হবে বলে গা ধুতে যাবার আগেই লণ্ঠন দুটোর কাচ পরিষ্কার করে, তেল ভরার থাকলে তেল ভরে, একেবারে জ্বালিয়ে রেখে যায় যমুনা। পল্‌তেটা শুধু কমিয়ে রেখে দেয়।

একটা লণ্ঠন তুলে পাশের ঘরে রাখল যমুনা, একটু উজ্জ্বল ক'রে। অন্ধকার হয়ে গেছে। আর একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল।

এতক্ষণ কি আর দাঁড়িয়ে আছে?

সদর খুলল যমুনা। বাইরের অন্ধকার আর হাওয়া যেন ঝাঁপ দিয়ে তার গায় পড়ল। কেউ নেই। গলা বাড়িয়ে দেখল যমুনা। না, কেউ নেই কোথাও। সামনের আধ-জঙ্গল ঢিবিগুলো থেকে বুনো লতাপাতা আর বন-তুলসীর গন্ধ ভেসে আসছে। কালো আকাশে

কতকগুলো তারা ? একটু দূরে উমাদের বাড়িতে গ্রামোফোন বাজাচ্ছে কেউ। একটা গানের অস্পষ্ট ভাঙা ভাঙা সুর ভেসে আসছে।

সদরটা আবার বন্ধ ক'রে দিল যমুনা। পিছু হঠতেই পায়ে মাড়াল। চিঠি। খামের চিঠি। হাতের লণ্ঠন নিচু করতেই দেখতে পেল। ঝুঁকে চিঠিটা কুড়িয়ে নিল।

বারান্দাটুকু পেরিয়ে আসতে আসতেই চিঠির ঠিকানাটা পড়ে নিল যমুনা। তারই নাম, তারই ঠিকানা।

ঘরে এসে টেবিলের ওপর চিঠিটা রাখল যমুনা। টেবল-ল্যাম্পটা আরও একটু বাড়িয়ে দিল। আবার ক'রে চিঠিটা হাতে করতেই, ঠিকানার লেখাটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে উঠল।

খামটা তখুনি ছিঁড়ে তার মধ্যের চিঠিটা বের করতে সাহস হ'ল না যমুনার। একটু যেন সময় দরকার। সামলে নেবার মতন সময়।

অন্যমনস্ক ভাবে আয়নাটা মুখের সামনে টেনে নিয়ে নিজের চোখ দেখল যমুনা, চোখের পাতার তলায় রক্ত। এবং গাল, দাঁত। এবং শেষ পর্যন্ত কপালটা। সিঁথিতে সিঁদুরের রঙটা টক্ টক্ করছে।

গা ধুতে যাবার আগে চুল আঁচড়ে বিনুনিটা বেঁধে রেখেছিল। সন্ধ্যা-প্রসাধন করার সময় ভেবেছিল খোঁপাটা ক'রে নেবে। এখন কেমন যেন ভীষণ অন্যমনস্ক ভাবে মুখে খানিকটা পাউডার ছিটিয়ে পাফ দিয়ে ঘষতে ঘষতে যমুনার মনে হল, খোঁপাটা আর বাঁধবার দরকার নেই। সিঁদুর পরবার জন্যে চিরুনীর আগাটা সিঁদুরকৌটোয় ডুবিয়ে হঠাৎ হাতটা আড়ষ্ট হয়ে গেল। এবং যমুনা আয়নায় আর একবার তার চোখের তলায় রক্ত খোঁজার চেষ্টা করল।

খামটা এইবার আস্তে আস্তে ছিঁড়ে ফেলল যমুনা। ফাঁকা ! ভেতরে কোন চিঠি নেই। এক টুকরো কাগজ অথবা কালির কোনও আঁচড় ? না, কিছু না। খামটা মুখের ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে ভেতরটা দেখল তবু। কিছুই না, কিচ্ছু না।

কিছুই নেই। তবু একটা ভয় খামের অন্দরমহল থেকে আস্তে আস্তে ভেসে উঠছিল। কিংবা বলা ভাল, একটা ভীত আচ্ছন্নের

বাতাস ক্রমশই গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে যমুনার মন এবং চিন্তাকে গ্রাস করতে লাগল। ঠিক যেন ইথারের গন্ধে কারও চেতনা অবশ হয়ে আসছে।

যমুনার চোখের সামনে টেবল-ল্যাম্পের আলোটা আরও মেটে-মেটে হলুদ মতন দেখাচ্ছিল। আয়নাটা কেমন জল বুলোনো—ঝাপসা।

আর তারপর যাকে ভাবছিল, আশঙ্কা করছিল, সে। অচিন্ত্য। কাশীর সেই গাইড। হোটেলের গাইড।

আয়নার ঝাপসা ভাবটা কেটে গিয়ে অচিন্তর ঈষৎ লম্বা, বসন্ত-দাগ, ফরসা মুখটা ভেসে উঠল।

যমুনা অপলকে সেই মুখ দেখছিল। সেই অতি বিনীত ভাবখানা। এবং আপাত হাসিটা।

অচিন্ত্য কি যেন বলি-বলি করছিল। যমুনা বুঝতে পারলে কি বলতে চায় ও। কথাটা শোনার কোন আগ্রহ নেই যমুনার। যেন অনেকবার সে কথা শুনেছে। এখন আবার ক'রে শোনার অর্থ সময় নষ্ট, বিরক্তি বোধ।

অচিন্ত্যর বলি-বলি ঠোঁটদুটোকে আচমকা থামিয়ে দিয়ে যমুনা বললে, 'তুমি আমায় ভয় দেখাতে এসেছ?'

জবাব নেই। কিন্তু মনে হ'ল, অচিন্ত্য মাথা নাড়ল। না, ভয় দেখাতে সে আসে নি।

'না। তবে এসেছ কেন?' যমুনার গলায় চাপা ভর্ৎসনা, চোখে ক্রোধ।

এবারও কোন জবাব নেই অচিন্ত্যর। বরং কেমন একটা অদ্ভুত কৌতূহল ওর চোখে ফুটে উঠেছে।

খানিকটা চুপ করে থেকে যমুনা বোধ হয় বুক হাতড়ে কাঠিন্য এবং সাহস সংগ্রহ ক'রে নিয়ে তৈরী হ'ল রূঢ় কথাটা বলতে, বলে ফেলতে। তারপর অচিন্ত্যর চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমি বিয়ে করেছি; এখন আমি অন্য লোকের স্ত্রী।' একটু থামল যমুনা। বলল আবার,

'আমার স্বামীকে আমি ভালবাসি।' শেষ শব্দটা অস্বাভাবিক একটা ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করল।

কথাগুলো শুনতে শুনতে অচিন্ত্যর বসন্ত-দাগ লম্বা মুখটায় দমকা হাস যেন ভেঙে পড়ল। অট্টহাসির ভঙ্গি। যমুনা কানের কাছে সেই হাসি শুনতে পাচ্ছিল। কী বিশ্রী আর কুৎসিত সেই হাসি।

হাসি থামলে অচিন্ত্য যেন হঠাৎ একটা হাত অন্ধকার থেকে খপ্ করে বাড়িয়ে দিল। আর হাতটা যমুনার কাঁধের ওপর গলার কাছ ছুঁয়ে থেমে গেল।

ভয় পেয়েছে যমুনা। সাংঘাতিক ভয়। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাবার মতন সাহসটুকু পর্যন্ত শূন্য হয়ে গেছে। অচিন্ত্যর হাতটা আরও জোরে চেপে বসছিল।

যমুনার গলা এবং বুকের মধ্যে একটা বাতাস বুঝি তোলপাড় করছে। বেরিয়ে আসার পথ চাইছে একটু।

শেষ পর্যন্ত প্রায় চীৎকারই ক'রে উঠল যমুনা। আর তারপর সব অন্যরকম হয়ে গেল। পালটে গেল গোটা আবহাওয়াটাই।

অচিন্ত্য নয়, মণিমোহন। মণিমোহন যমুনার পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে একটা হাত স্ত্রীর কাঁধে রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

যমুনার ঘোর কাটতে প্রথমেই সে ঘাড় ঘুরিয়ে স্বামীর হাতটা ছুঁয়ে দেখল, কোথায় আছে, কিভাবে? ঠিক তেমনি ভাবেই। অচিন্ত্যর হাত যেমনটি ছিল। কাঁধের ওপর, গলা ছুঁয়ে।

'তুমি?' যমুনার বিস্ময় তখনও কাটে নি। ভয়টাও নয়।

'ব্যাপার কি, খুব তন্ময় হয়ে আয়নায় মুখ দেখছিলে?' মণিমোহন বলল।

যমুনা ঈষৎ ঝুঁকে পড়া পিঠটা সোজা করতে করতে হঠাৎ আলতো আঁচলটা টেবিলের ওপর অন্যমনস্ক ভাবে ছড়িয়ে দিল। তারপর টেবিলের দিকে পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়াল। হাত দুটোও পিছনে। টেবিলের ওপর। আঁচলের আড়ালে।

'তুমি কখন এলে?' যমুনা বলল।

'তা খানিক্ষণ।'

'সদর কি খোলা ছিল?' যমুনা আবার শুধোল।

'হ্যাঁ। ভেজান ছিল।' মণিমোহন জবাব দিল।

'সে কি?' যমুনা আরও অবাক!

মণিমোহন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছিল। বলল, 'ওরকম ভুল হয়। কার জন্যে কখন যে দরজা খুলে রাখতে হয়—।' কথাটা শেষ করল না মণিমোহন।

যমুনার এই পরিহাস পছন্দ হল না। বিরক্ত হয়ে বললে, 'কি বাজে ইয়ার্কি কর!' যমুনা একটু চুপ থাকল। বলল তারপর, 'বস, চা করে আনি। আজ যে এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে? চাকরী হয়ে গেল?'

'ভাল লাগছিল না, চলে এলুম। বিনয়কে সামলাতে বলে এসেছি।'

যমুনা বোধ হয় চা তৈরী করতে চলে যাচ্ছিল। মণিমোহন হঠাৎ বললে, 'কার যেন চিঠি এসেছে দেখলাম। কার চিঠি?'

যেতে যেতে যমুনা দাঁড়িয়ে পড়ল। পা দুটো হঠাৎ পাথর হয়ে মাটির সঙ্গে এঁটে গেছে। বুকের মধ্যে আবার একটা ভয়! হৃদপিণ্ডটা ছুটন্ত ঘোড়ার মত বেসামাল। আঁচলের তলায় একটা হাত অসাড়। মুঠোর মধ্যে খামটা কেমন যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে।

'কার চিঠি।' মণিমোহন আবার শুধালো।

'চিঠি?' অন্ধকার থেকে যমুনা মুখ ফেরাল সামান্য, 'কই না! কার চিঠি আবার দেখলে তুমি? একটা পুরণো চিঠির খাম কুড়িয়ে এনেছিলুম চুলগুলো ফেলবার জন্যে। আজকাল কী ভীষণ যে চুল উঠছে আমার। মাথা আঁচড়াতে বসলেই এক মুঠো। একটা ভাল তেল এনো তো!' যমুনা আর দাঁড়াল না।

রান্নাঘরে এসে আঁচ-ওঠা উনুনটার দিকে একটু চেয়ে থাকল যমুনা। কী গনগনে লাল। একবার বাইরে তাকাল উঠোনের দিকে, তারপর হাতের খামটা উনুনে গুঁজে দিল। আগুনের একটু শিখা জ্বলে উঠল। চায়ের কেটলিটাও চাপিয়ে দিল যমুনা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

ভয়টা আস্তে আস্তে কেটে আসছিল, খামটা ছাই হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। আর যমুনা ভাবছিল, অচিন্ত্যও তো আজ তার কাছে ছাই হয়ে গেছে। তবু এ-রকম হয় কেন? কেন?

কেন হয় ভাবতে বসে যমুনা অচিন্ত্যকে না ভেবে অন্য কথায় তন্ময় হয়ে গেল। সদরটা কি সত্যই সে খুলে রেখেছিল? এ-রকম ভুল তার হবে! এককালে যমুনা হয়ত একটু বেশি রকম সাহসী ছিল। কিন্তু আজকাল সাহসটা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। তার বদলে ভয়। যমুনার আজকাল বড় ভয়। এই ফাঁকা ফাঁকা জায়গাটা দুপুর থেকেই সে সব সময় সদর আগল দিয়ে রাখে। চিঠিখানা কুড়িয়ে আনার সময় এতই কি বেভুল হয়েছিল যমুনা যে সদর খিল না দিয়েই চলে এল!

মণিমোহনের কথাটা মনে পড়ল। 'কার জন্যে কখন যে দরজা খুলে রাখতে হয় —?' কী কথা! কী বিশ্রী! যেন যমুনা যাকে-তাকে এনে ঘরে বসাবার জন্যে দরজা হাঠ করে খুলে রেখে দিয়েছে!

'অচিন্ত্য আসবে জেনে দরজা খুলে রাখব—?' কথাটা মনের কোণে ঠাঁই পর্যন্ত পায় না যমুনার। কোথায় অচিন্ত্য আর কোথায় সে।

মণিমোহনের চোখ কিন্তু বড় তীক্ষ্ণ। চিঠিটা সে ঠিক লক্ষ্য করেছে। কথাটা কি বিশ্বাস করল না মণিমোহন, কৈফিয়ৎটা! না করার কি আছে!

কেটলির ঢাকনাটা থরথর করে কাঁপছিল। যমুনার মনে হল, ওর মন এমনি ভাবে যেন কাঁপছে ভেতরে।

ক'দিন যেতে না যেতে আবার। এবার আরও একটু সন্ধ্যে করে। যমুনার হাত জোড়া ছিল, কড়া নাড়ার শব্দ শুনে সাড়া দেয়নি। কিন্তু একটুক্ষণ পরে সদরের খিল খুলে দেখে, ভোঁ ভোঁ। কেউ নেই কোথাও। আশেপাশে একটা অস্পষ্ট ছায়া পর্যন্ত না।

এবারও সেই চিঠি। তেমনি হলুদ-রঙ খাম। গোটা গোটা করে ঠিকানা লেখা। যমুনার নাম ধাম।

চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে ঘরে আসতে আসতে যমুনা ভাবল, কালই সকালে পিয়ন এদিক পানে ডাক বিলি করতে এলে তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। জানতে হবে, এ শহরে ডাক বিলির নিয়ম কি পাল্টে গেল? আগে শুধু একবার ডাক বিলি হত, এখন থেকে দু-বার করে হচ্ছে নাকি—সকালে আর সন্ধ্যেতে?

চিঠিটা কুড়িয়ে ঘরে যেতে যেতে কি ভেবে যমুনা একটু থামল। তারপর শোবার ঘরে না গিয়ে ফিরে গেল রান্নাঘরে।

বাতিটা একটু উস্কে দিয়ে পিঁড়ির ওপর বসল। সামনে উনুনের ওপর কড়াইটা বসান। জল-ফোটার শব্দ। মৃদু একঘেয়ে।

যমুনার তেমন আর কৌতুহল নেই। এ-চিঠি কার, কেন—সব যেন সে বুঝতে পেরেছে। আর শুধু বোঝা নয়, যেন পরিণতিটাও তার অনুমানের বাইরে নয়।

আচমকা একটা নিশ্বাস ফেলে খামের মুখটা নখ দিয়ে আস্তে আস্তে ছিঁড়ে ফেলল যমুনা। তারপর আঙুল ডুবিয়ে দিল।

না, চিঠি নেই। এবারেও কোন চিঠি এল না। যমুনার ভয়ঙ্কর অস্বস্তি হচ্ছিল। বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা একটু একটু করে অস্বাভাবিক হয়ে আসছে।

এর মানে কি? এই চিঠি অথচ চিঠি নয়! নাম ঠিকানা লেখা হলুদ খাম, অথচ শূন্যগর্ভ।

খামের গহ্বরে একটা ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে দেখল যমুনা। একেবারে তলায় একটা যেন কী আছে। তালুর ওপর খামের মুখটা উল্টে ঝাড়তেই আধ ইঞ্চিটাক একটা কাগজ খসে পড়ল। দেখল যমুনা। খুব পাতলা কাগজে মোড়া, হালকা—ভীষণ হাল্কা একটা পুরিয়া। ডাক্তারখানায় যেমন ওষুধের পুরিয়া দেয় তেমনি।

কাগজের মোড়কটা খুলতে না খুলতেই হৃদপিণ্ডটা যেন গলার কাছে লাফিয়ে এসে থেমে গেল। যমুনা নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু অস্বাভাবিক আতঙ্কটা অনুভব করতে পারছিল। হাত কাঁপছিল যমুনার। গলায় শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। এবং ভয়ঙ্কর

এক আড়ষ্টতা পা হাত ঘাড়—গোটা শরীরটাকেই যেন গ্রাস ক'রে ফেলেছিল।

যমুনার খেয়াল নেই, কতক্ষণ এই অবস্থাটা ছিল। তারপর আচমকা কার ছোঁয়া গায়ে লাগল। যমুনা ঘাড় ঘোরাল না, ফিরে তাকাল না। শুধু খাপছাড়া দুঃস্বপ্নের ঘোরে কথা বলার মতন বলল, 'আমায় আবার ভয় দেখাতে এসেছ?'

কোন জবাব নেই। রান্নাঘরের ঝুল ভর্তি কালো অন্ধকার থেকে একটা টিকটিকি টিক্ টিক্ ক'রে উঠল। উনুনের ওপর বসান তরকারীর কড়াই থেকে গন্ধ উঠছে।

একটু চুপচাপ। যমুনা বিড়বিড় করে আবার বলল, 'অযথা আমায় তুমি বিরক্ত করছ! আমি পরস্ত্রী। আমার স্বামীকে আমি ভালবাসি।'

মনে হ'ল যমুনার পিছনে কেউ একজন হঠাৎ হাসির গমকে ভেঙে পড়ল।

হাসিটা আর থামছিল না। যমুনার বুকে সেই হাসির তরঙ্গগুলো ধাক্কা দিচ্ছে। অসহ্য কষ্ট।

যমুনার আর সহ্য হচ্ছিল না। চিৎকার ক'রে বলল যমুনা, 'তুমি যাও অচিন্ত্য। পায়ে পড়ি তোমার, চলে যাও।'

কাশীর হোটেলের গাইড অচিন্ত্য অত সহজে যাবার পাত্র নয়। তার হাসি থামল, কিন্তু হাতটা থেমে থাকল না। অন্ধকার থেকে কী যেন একটা টুপ করে তরকারির কড়াইয়ে ফেলে দিল।

যমুনা ভীষণ ভাবে চমকে চিৎকার ক'রে উঠল।

কতক্ষণ কে জানে হঠাৎ বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ কানে গেল যমুনার। অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে কে যেন কড়া নেড়ে চলেছে। মণিমোহন। হ্যাঁ, তার ধরনটা ওই রকমই।

পিঁড়ির ওপর থেকে উঠতে উঠতে হঠাৎ কি যেন দেখল যমুনা। তারপর তরকারির কড়াইটা উনুনের ওপর উল্‌টে দিল। সেই সঙ্গে খামটাও।

ঘাম-ঘাম শরীরে এসে দরজাটা খুলে দিল যমুনা। মণিমোহন!

'কি ব্যাপার, ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি? কতক্ষণ থেকে কড়া নেড়ে চলেছি—!' মণিমোহন স্ত্রীর মুখ দেখবার চেষ্টা করে।

সদরে খিল তুলে দিয়ে ফিরতে ফিরতে জবাব দেয় যমুনা, 'বলো না! এক কাণ্ডই করলাম! অমন সুন্দর তরকারি—কড়াইটা নামাতে গিয়ে একেবারেই উনুনের মধ্যেই উল্‌টে গেল! হাত-পা পুড়তো আর একটু হলেই।'

'পুড়ে যায় নি তো?' মণিমোহন রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল। তারপর গলা বাড়িয়ে রান্নাঘরের ভেতরটা একবার দেখে নিল, 'শরীরটা ভাল নেই, আজ আর আমি কিছু খাব না।'

যমুনা স্বামীর মুখের দিকে ভাল ক'রে চাইবার চেষ্টা করল। পারল না। একটা ঘন কালো পর্দা যেন সেই মুখের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। কিছুই ঠাওর করা চলে না।

মণিমোহন শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। যমুনা রান্নাঘরেরদিকে।

উনুনটার কাছে এসে দাঁড়াল যমুনা। আঁচের ওপর খানিকটা তরকারি তখনও পুড়ছে। কড়াইটা মাটিতে নামানো। আঁচে একটা দিক পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া খামটার সামান্য একটু কোণা কি ক'রে যেন তখনও কালো হয়ে রয়েছে। গুঁড়িয়ে ছাই হয়ে মিশে যায় নি।

পুরিয়াটার কথা মনে পড়ল যমুনার। চমকে উঠে খুঁজল এপাশ ওপাশ। খুঁজে পেল না। পুরিয়াটা কোথায় যে ফেলল যমুনা ঠাওর করতে পারল না। ভয় হ'ল, ভীষণ ভয়। তবে কি আঁচলে বা কোলের মধ্যে পড়েছিল, বাইরে যাবার সময় উঠোনে পড়ে গেছে?

লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠোনে নেমে গেল যমুনা। আঁতি-পাতি ক'রে খুঁজল। কোথাও খুঁজে পেল না।

ঘরের মধ্যে থেকে মণিমোহন বোধ হয় দেখছিল। বলল, 'কি খুঁজছ বাতি হাতে?'

প্রথমে কথা নেই। তারপর অস্পষ্ট গলায় জবাব, 'কানের দুলটা খুলে পড়ে গিয়েছিল।'

'পেয়েছ ?'

'হ্যাঁ।' যমুনা কানের ডগায় হাত দিয়ে আচমকা জবাব দিয়ে বসল। আর তারপর ইচ্ছে সত্ত্বেও আর উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে অন্যমনস্ক ভাবে ঘরে চলে গেল।

কিছুদিন পর স্বামী-স্ত্রীতে এই ধরনের কথাবার্তা হচ্ছিল এক সকালে।

'তোমার শরীরটা অমন ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন আজকাল ?' মণিমোহন স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে শুধালো।

উঠোনের রোদে পরিষ্কার মেঝেতে টুকিটাকি কতকগুলো জিনিস কাচছিল যমুনা। সাবানের ফেনায় হাত ভরা। ফেনাগুলো জল কেটে কেটে গড়িয়ে যাচ্ছে। একটু দূরে বেতের মোড়ায় বসে দাড়ি কামাচ্ছিল মণিমোহন। কামানো শেষ হয়েছে সবে।

স্বামীর দিকে মুখ ফিরিয়ে একবার তাকাল যমুনা। আবার সঙ্গে সঙ্গে মুখ নামিয়ে সাবান মাখাতে শুরু করল।

'শরীর খারাপ ?' মণিমোহন আবার বলল।

'না। ভালই তো আছি।' যমুনার সংক্ষিপ্ত জবাব।

মণিমোহন কাছে সরে এল। খুব ভাল ক'রে দেখল যমুনাকে, যমুনার গোটা শরীরটাকে।

স্বামীর দিকে না চাইলেও মণিমোহনের চোখের দৃষ্টিটা তার গায়ের যেখানে যেখানে পড়ছে যমুনা অনুভব করতে পারছিল।

'তোমার কি আর কোন কাজ নেই ?' খুব অস্বস্তিভরা গলায় যমুনা বলল, 'যাও না, কতদিন ধরে বেতের চেয়ারটায় রঙ দিতে বলছি— রঙ দিয়ে দাও। ঘরে রঙ আনানো রয়েছে। সংসারের দুটো কাজ করতে বললে অমন এড়িয়ে যাও কেন ?'

'হবে, হবে।' মণিমোহন বাধা দিল, 'তোমায় যা জিজ্ঞেস করছি, তাই বল তো ! কি হয়েছে, তোমার ?'

'কিছু না।'

'বিশ্বাস করব না। সত্যি ক'রে বলো না কি হয়েছে ?'

'কি মুশকিল।' যমুনা এবার সাত্যই বিরক্ত হয়ে স্বামীর দিকে তাকাল। বলল, 'বলছি কিছু হয় নি, তবু কানের কাছে বার বার এক কথা! হবার যদি কিছু থাকে হয়েছে, আমি জানি না।'

'দিব্যি ক'রে বলছ তুমি জানো না?'

'দিব্যির আবার কি আছে! কী যে আজেবাজে কথা তুমি বল।'

একটু চুপচাপ। হঠাৎ মণিমোহন বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয় তুমি জান।'

সাবানের ফেনা মাখা হাত দু'খানা তুলে স্বামীর দিকে ভীষণ আতঙ্কে চেয়ে চুপ ক'রে গেল যমুনা।

মণিমোহন উঠে দাঁড়াল। চলে যাচ্ছিল। যমুনা আচমকা বললে, 'তুমি আমায় সন্দেহ করো।'

মণিমোহন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। তার মুখে যেন একটু হাসি ছিল। বলল মণিমোহন, 'ছি ছি, কী বলছ? সন্দেহ! সন্দেহের কথা উঠছে কেন? তোমার শরীরটা খারাপ দেখছি তাই জানতে চেয়েছিলাম।' কথাটা শেষ ক'রে মণিমোহন রবারের চটির শব্দ তুলে চলে গেল ঘরে। আর যমুনা হাতের সাবান-ফেনাগুলো হাতেই শুকোতে দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে নালিটার দিকে চেয়ে থাকল। সাবান কাটা ময়লা জলগুলো যেখান দিয়ে চলে যাচ্ছে।

দুটো কি তিনটে দিন, তারপর সে এল। অনেক রাত তখন। খুব মিহি একটু চাঁদ আকাশে। ভীষণ কুয়াশা। বাইরে তাকালে মনে হয় যেন গুঁড়ো গুঁড়ো তুলো ঝরছে। সামনের ঝোপঝাড়গুলো বুনো লতাপাতার গন্ধে ভরা। উত্তর থেকে হাওয়া দিচ্ছে। দূরে কোথাও যেন একটা রুগ্ন কুকুর কাঁদছে করুণ ভাবে।

কড়া নড়ে উঠল। যমুনা যেন জানত। তারই অপেক্ষায় ছিল। বিছানা ছেড়ে উঠে টেবিল-ল্যাম্পের মিটমিটে আলোটুকু পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন ক'রে দিল ফুঁ দিয়ে। তারপর অন্ধকার ঘর দিয়ে, একটু আলো-আভা

বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আকাশে মিহি চাঁদ। ভীষণ কুয়াশা। উত্তরের হাওয়া বইছে। দূরে রুগ্ন একটা কুকুরের কান্না।

সদরের দিকে যেতে যেতে যমুনার মনে হ'ল, এই ঠিক তার আসার সময়।

খিল খুলে দিয়ে দাঁড়াল যমুনা। দরজাটা একটু টেনে ধরল।

বাতাস গলে আসার মতন সে চলে এল। ওইটুকু ফাঁক দিয়ে। যমুনার গায়ে এসে পড়ল। এখানটায় অন্ধকার।

কোনও কথা নেই। সদরে খিল তুলে দিল যমুনা। অথচ বুঝতে পারল তার সঙ্গী এটা পছন্দ করছে না। না করুক।

ছোট্ট উঠোন। সেটুকু পেরুতে গিয়ে যমুনা আবার একবার আকাশের মিহি চাঁদটাকে দেখল। তার কান্না পাচ্ছিল ওই দুস্তর ব্যবধানের মিহি চাঁদটার নিঃসঙ্গতা আর নির্বাসন অনুভব করে। বড্ড কুয়াশা। গায়ে লেগে থাকে। নিজের হাত, গা পর্যন্ত দেখা যায় না উত্তরের বাতাসটা আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে। কুকুরটা যেন কাঁদতে কাঁদতে এ-বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ল।

বারান্দাটুকু পেরিয়ে ঘর। ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভালুক-গা কালো বাতাস যেন এই ঘরে তালাবন্ধ হয়ে রয়েছে।

যমুনার নিশ্বাস-ছন্দ অস্বাভাবিক। মাথার মধ্যে কেমন একটা রক্তের চাপ। কিছুই ভাবা যায় না, ভাবতে পারা যায় না।

'অচিন্ত্য ?' নিশ্বাসের সুরে ডাকল যমুনা।

'কি ?'

'আমায় ছোঁও।'

'ছুঁয়েছি।'

'আমার বুকে হাত দাও।'

'দিয়েছি।'

'এ কে ?'

'আমি।'

'ঠিক বলছ ?'

'বলছি।'

হঠাৎ চুপ। পাথরের মতন ভারি আর অসহ্য নীরবতার ভার যেন এই ঘরে আস্তে আস্তে নেমে এসেছে।

'তুমি কি এখনও আমায় ভালবাসো অচিন্ত্য ?'

'ভালবাসি।'

'আমি পরস্ত্রী।'

'তুমি পরভৃতিকা।'

যমুনার ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল গলার নলীটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে জল খুঁজে নিল যমুনা। জলটা খেয়ে ফেলল চুমুকেই। ভয় হয়েছিল খুব। কিন্তু তার চেয়ে ভয়াবহ মানুষটা সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'একটু বসি। একটু।' যমুনা মিনতি করল।

'বসো।'

মণিমোহনের বিছানা ঘেঁসে, গা ছুঁয়ে বসল যমুনা।

সময়টা অন্ধকারে যেন ফেনার মতন ভেসে উঠে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে। বড় ঘুম পাচ্ছিল যমুনার। ভীষণ ঘুম।

সকালে উঠে মণিমোহন দেখল যমুনা তার পাশে শুয়ে। ডাকল। সাড়া পেল না। গা নাড়া দিল। তবুও সাড়াশব্দ নেই।

মণিমোহন আস্তে আস্তে উঠে যমুনার বাক্সটা খুলে ফেলল। অচিন্ত্যর চিঠির বাণ্ডিলগুলো অনেক আগেই পড়া হয়ে গেছে। সেগুলো তুলে এনে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রাখল। তারপর আস্তে আস্তে বসে একটা নতুন খামে ঠিকানা লিখল, যমুনার ঠিকানা। আর একটা পুরিয়া কোন ফাঁক থেকে বের ক'রে খামের মধ্যে পুরে টেবিলের ওপর রেখে দিল।

তারপর মাথার চুলগুলো উস্কো-খুস্কো ক'রে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল লোক ডাকতে।

পিয়ারীলাল বার্জ

পিয়ারীলাল বার্জ।

নামের চেয়ে মানুষটা আরো অদ্ভুত। রেভারেণ্ড মণ্ডলের চিঠি নিয়ে ও এসেছিল ডলবি সাহেবের কাছে। ডলবি সাহেব মধুবন কোলিয়ারীর ডাকসাইটে ম্যানেজার। ম্যানেজারের খাস কামরায় চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে পড়ল পিয়ারীলাল। খড়ের ছাউনী করা বাড়ি। দেওয়ালের অর্ধেকটা সাদা চুনকাম করা, বাকি নীচের অর্ধেক আলকাতরা মাখানো। অফিসের সামনে তেঁতুলগাছের ছায়ার তলায় খান দুয়েক গাড়ি দাঁড় করানো রয়েছে। বসে থাকতে থাকতে পিয়ারীলালের নেশা চড়ে ওঠে। থমথমে, চুপচাপ—নিরিবিলি দুপুর। ঘুঘু ডাকছে। মাঝে মাঝে দূর কারখানা থেকে লোহা পেটার শব্দ আসছে ভেসে।

পিয়ারীলাল সবেমাত্র নতুন করে একটা পাশিংশো ধরিয়েছিল। ছুঁড়ে ফেলে দিলো সিগারেট। মাউথ অর্গান বের করে বাজাতে লাগল পরমানন্দে। ডলবি সাহেবের দ্বারোয়ান গিয়েছিল পাশের অফিসে কি কাজে। ফিরে এসে পিয়ারীলালের কাণ্ড দেখে তার চক্ষুস্থির। মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে ছুটে এল রামব্রিজ: হায়রে বাপ, বড়া-সাহেবকা নিদ্ টুট যানেসে নোক্‌রি চালা যায়গা। আরে এ সাহেব…! রামব্রিজ পিয়ারীলালের পাশে এসে রক্তচক্ষু, উগ্রকণ্ঠ হল। তাতে অবশ্য কিছু এলো গেল না পিয়ারীলালের।

গণ্ডগোল একটা পাকিয়ে উঠছিল। হঠাৎ পর্দা সরিয়ে স্বয়ং ডলবি সাহেব বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

বড় সাহেবের গলা শুনে রামব্রিজ সাত পা লাফিয়ে সরে গিয়ে সেলাম ঠুকলো। ইঙ্গিতে পিয়ারীলালকে ডেকে বড় সাহেব আবার পর্দার অন্তরালে অদৃশ্য হলেন।

পিয়ারীলাল মাউথ অর্গানটা পকেটে পুরে গা হাত পা একটু ঝেড়ে নিল। গলা থেকে রুমালটা খুলে মুখ মুছল। তারপর নিঃসংকোচ, দ্বিধাহীন পদক্ষেপে এগিয়ে গেল শিস্ দিতে দিতে।

ঘরে ঢুকে পিয়ারীলাল দেখে কোণের একটা আর্ম-চেয়ারে ডলবি সাহেব গা এলিয়ে শুয়ে রয়েছেন। পাশে টিপয়ের ওপর খান কয়েক প্লেট্, কাঁচের ছোট কুঁজো আর বিয়ারের বোতল। আর্ম-চেয়ারের হাতলের ওপর শূন্য গেলাস।

তুপুরে লাঞ্চ শেষ করে ডলবি সাহেব বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।

পিয়ারীলাল ঢুকতেই ডলবি সাহেব চোখের পাতা বন্ধ রেখেই হাঁকলেন, 'প্লে অন্……!'

হক্চকিয়ে গেলো পিয়ারীলাল। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে সময় লাগলো খানিকটা। তারপর একটানা বিশ মিনিট কী তারও বেশি পিয়ারীলাল মাউথ অর্গান বাজাল ডলবি সাহেবের অফিসে, তাঁরই সামনে দাঁড়িয়ে। পর্দার বাইরে চুপিসারে কম-সে-কম এক ডজন এ্যাসিস্‌টেণ্ট আর বাবুর দল ভিড করে পরম বিস্ময়কর ব্যাপারটা অনুধাবনের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকল।

পিয়ারীলাল থামলে ডলবি সাহেব খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে চুপ করে থাকলেন। শেষে চোখ মেলে পিযারীলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রেভারেণ্ড লিখেছেন, তুমি ভালো ফুটবল খেলতে পারো—'

বড় সাহেবের কথা শেষ হয় নি, পিয়ারীলাল প্যাণ্টের পকেট থেকে মুঠো করে একগাদা মেডেল বের করে আর্ম-চেয়ারের হাতলের ওপর রেখে এক অদ্ভুত ভঙ্গিমায় ঘাড় নাচিয়ে নাচিয়ে হাসল। অর্থটা এই—তুমি দেখো আরো কতো ম্যাজিক জানে পিয়ারীলাল।

মেডেলের দিকে একটু তাকিয়ে ডলবি সাহেব এবার বললেন— 'কিন্তু তুমি কোনো কাজ জানো না?'

পিয়ারীলাল মাথা নাড়লো। না, জানি না।

ডলবি সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন পিয়ারীলালকে মেডেলগুলো তুলে নিতে।

মেডেলগুলো তুলে পকেটে পুরলো পিয়ারীলাল।

—তোমায় আমি উপস্থিত একটা চাকরি দিচ্ছি, মাষ্টার বার্জ। এই সিজনে কোলফিল্ড্ টুর্নামেণ্টের 'রাজ শিল্ড' আমার কলিয়ারীতে আসা চাই। যদি শিল্ড আনতে পারো, চাকরি থাকবে, না হলে তাড়িয়ে দেবো—। মাইণ্ড দ্যাট !

পিয়ারীলাল ছোট ছোট চোখ করে মুখ ফুলিয়ে হাসল। তার মুখের ভাবটা এমন, এ আর কি নূতন কথা !

ডলবি সাহেব টেবিলের সামনে গিয়ে চেয়ারের মধ্যে ডুবে বসলেন।

—বাইরে অপেক্ষা করো। অফিস থেকে তোমায় চিঠি দেবে।

পিয়ারীলাল তার সাবেক রীতিতে ছ'পা পিছিয়ে এসে নড্ করার ভঙ্গি করে বললে,'থ্যাঙ্ক্ য়ূ—স্যার।'

পিয়ারীলাল সেই থেকে মধুবন কোলিয়ারীতে।

মধুবন কোলিয়ারীর হয়ে 'রাজ শিল্ড্,' সত্যি সত্যিই ও জিতে আনলো। সারাটা সিজ্ন্ পাগলা-ঘোড়ার মতন একাই এগারোজনের খেলা খেলে তাক লাগিয়ে দিল ও সকলকে। আর সেই থেকে ডলবি সাহেব বার্জ বলতে অজ্ঞান। পিয়ারীলালের আগে কাজ ছিলো এ্যাসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার সেনগুপ্ত সাহেবের অফিস দেখা। কাজটা বেয়ারাদের কাজের মতনই। শিল্ড জিতে আনার পর সেনগুপ্ত সাহেব ওর পিঠ চাপড়ে বললেন—'পিয়ারীলাল, তুমি আমাদের ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন। তোমায় একটা অনারেব্ল পোস্ট দিতে হয়। দাঁড়াও, দেখি একটা ব্যবস্থা করি—।'

ব্যবস্থাও হল একটা। পিয়ারীলালের জন্যে আরও ভাল ব্যবস্থা হতে পারত। সে চেষ্টাও করেছিলেন সেনগুপ্ত সাহেব। দুঃখের বিষয়, তাতে উল্টো ফল ফলল। পিয়ারীলাল সব পারে —পারে না শুধু মাথার কাজ। অসম্ভব রকমের বোকা ও—সাতবার একটা কাজ শিখিয়ে দিলে উনপঞ্চাশবার ভুল করে বসবে। তার ওপর মাথায় বেশ একটু ছিট আছে। এক করতে এক করে বসে—

এক বলতে এক বলে ফেলে। ভেবে-চিন্তে পিয়ারীলালকে তাই এমন কাজ দেওয়া হল, যাতে মাথার কাজ তো দূরের কথা, হাতের কাজও করতে না হয়।

কয়লা বোঝাই হবার জন্যে খালি মালগাড়িগুলো এসে দাঁড়ায় তিন নম্বর পিটের সামনে। পিটটা আজ আট-দশ বছরের বেশি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। ওর প্রতি সকলের অবজ্ঞা। পাশেই ভাঙা ইঞ্জিনঘরটার সব ক'টা টিন অনেক আগেই উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে যাবতীয় যা কিছু কাজে আসতে পারে।

পিয়ারীলালকে এখানে জুতে দেওয়া হল। এই ভগ্ন, জীর্ণ তিন নম্বর পিটের মুখেই ওর কাজ। কাজটা অবশ্য খাটুনির নয়—কিন্তু বড়ই একঘেয়ে। সকাল আটটা থেকে বেলা বারোটা। তারপর আবার একটা থেকে বিকেল পাঁচটা—যতক্ষণ না পাওয়ার হাউসের গলাভাঙ্গা সিটিটা বেজে ওঠে। পিয়ারীলালের একটা চিট্ ময়লা খাতা আছে। সেই খাতায় রোজ ওকে কয়লা বোঝাই হবার পর মালগাড়িগুলোর নম্বর টুকে রাখতে হয়। বিকেলে যাবার সময় অফিসে গিয়ে একবার শুধু জানিয়ে দেওয়া—সারাদিনে কটা মালগাড়ি বোঝাই হল। পরের দিন পিয়ারীলাল এসে দেখে স্টেশন থেকে ইঞ্জিন এসে বোঝাই গাড়িগুলা টেনে নিয়ে গেছে। কিংবা অন্য একটা সাইডিংয়ে রেখে খালি গাড়ি লাগিয়ে দিয়ে গেছে লাইনে।

সকাল-বিকেল পিয়ারীলালের এই কাজ—হাঁ করে গাড়ি বোঝাই দেখা।

নতুন জায়গায় এসে দিন কয়েক যেতে না যেতেই পিয়ারীলাল সোজা একদিন সেনগুপ্ত সাহেবের কাছে গিয়ে বললে, তার একটা অফিস চাই, আর চাই নামওয়ালাপদ। না হলে লোকের কাছে বলবে কি? সেনগুপ্ত সাহেব পিয়ারীলালের গলার স্বরে মুখ তুলে তাকিয়ে প্রায় হেসে ফেলেন আর কী। শেষে বলেন—তোমার পছন্দমত একটা কিছু বানিয়ে নাও। কিন্তু খেয়াল থাকে যেন, ওয়াগন নম্বর টুকতে ভুল না হয়।

—ইয়াস স্যার। এ্যাণ্ড ষ্টিলিং? ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলার ঝোঁক আনল পিয়ারীলাল তার গলার স্বরে।

—নিশ্চয়। কয়লা চুরি দেখতে হবে বই কি!

পিয়ারীলালকে আর পায় কে। ভাঙ্গা ইঞ্জিনঘরের চারপাশে যতো রাজ্যের আকন্দ আর ফণিমনসা গাছের ঝোপ, কয়লার চাঁই, ভাঙ্গা লোহালক্কড় জমা হয়েছিল। এরই একটা পাশ নিজের হাতে পরিষ্কার করে দুখানা টিনের জোড় লাগিয়ে পিয়ারীলাল তার অফিস করল। মিস্ত্রীকে বলে বানালো একটা কেরাসিন কাঠের চেয়ার আর নড়বড়ে টেবিল। তারপর দিব্যি আরামে টেবিলের ওপর পা তুলে বসে পিয়ারীলাল তার অফিস করতে লাগল।

কুলিকামিন আর কন্‌ট্রাক্‌টাররা ওকে ডাকতে শুরু করল 'লোডার সাহেব'। পিয়ারীলাল যে বাবু নয়—যত কালোই হোক, তবু যে সে সাহেব, তা ওরা জানতো। লোকমুখে শুনেছে, পিয়ারীলাল খ্রীশ্চান। আর নিজেরা দেখেছে, পিয়ারীলাল রোববার রোববার দোপাটি ফুল পকেটে গুঁজে, সেজে-গুজে গির্জেয় যায়। তা ছাড়া পিয়ারীলালের কথা হিন্দী, বাংলা, ইংরিজী—তিন মিলিয়ে সে এক অপূর্ব বস্তু। কাজেকাজেই পিয়ারীলাল বার্জ—লোডার-সাহেব না হয়ে যায় কোথায়।

পিয়ারীলাল অফিস ডিসিপ্লিন মানতে আজকাল পছন্দ করে। অন্তত ওকে ডাকার ব্যাপারে। তবে বেচারীকে সারাদিন এক জায়গায় ঠায় বসে থাকতে হয় উপায় কি—তাই খেয়াল হলেই পকেট থেকে মাউথ অর্গান বের করে বাজায়।

কাজের ফাঁকে অনেকেই পাওয়ার হাউস থেকে পালিয়ে এসে পিয়ারীলালের কাছে বসে। গল্পগুজব করে। বিড়ি-সিগারেট ফোঁকে। বলে—বেড়ে আছো বাবা পিয়ারীলাল। ধন্যি তোমার পদযুগল। শালা খেলেই এতো, না জানি খেলালে কতো হত।

পিয়ারী মুচকি মুচকি হাসে।

—নাইস্ প্লেস।

—তা তো বুঝলাম। একদিন সুইচ্‌বোর্ড এ্যাটেণ্ডার পঞ্চু সাহানা বললো, 'কিন্তু পিয়ারীলাল, এই কয়লার কুলে বসে বাঁশি বাজিয়ে তুমি নাকি বাবা এক রাধা পাকড়েছ?'

—কিয়া? পিয়ারীলাল চোখ কুঁচকে প্রশ্ন করে।

—রাধা। কেষ্টোর আঁটাকাঠি। ইউ ডোণ্ট নো আঁটাকাঠি? প্রণয়ী গো, ভজা সাহেব। প্রেম বোঝো—লভ্‌—ওয়াইফ্‌? পিয়ারী—পিয়ারী বোঝো না, সাহেব; নাম তো এদিকে পিয়ারীলাল।

পঞ্চু সাহানার কথায় পিয়ারীলাল হো হো করে হেসে উঠল।

—বুঝতে পারছি, পঞ্চা। পিয়ারী বলল, ডার্লিং। ইয়াস্‌। হামকো এক গার্ল হ্যায়।

—কাঁহা হ্যায় সাহেব? বিউটিফুল হ্যায়—? পঞ্চু বড় বড় চোখ করে জানতে চায়।

—সিওর। সি ইজ এ কুইন। পঞ্চা, হাম উসকো ম্যারী করেগা।

—একেবারেই ম্যারি। তুমি তো সাহেব ভালো ফুটবল খেল—তা ম্যারির আগে একটু কেয়ারী করলে পারতে না?

পিয়ারীলাল কিছু না বুঝেই মাথা নাড়ল।

—তা জাত কি? তোমাদের মত দো-আঁশলা, না অন্য কিছু।

—হোয়াট? জাত—? ইয়াস জাত হ্যায়! তুম্‌কো জাত।

—আমার জাত! পঞ্চুর গলা হঠাৎ বুজে এলো। অবাক চোখে পিয়ারীলালের দিকে খানিকটা তাকিয়ে পঞ্চু উঠলো। বললে, 'তুমি শালা সাহেব রাম-বজ্জাত। যাক্‌, আজ আখড়ায় আসছ তো? রিহার্সল দিতে হবে।'

—সিওর।

পঞ্চু সহসা চলে গেল। পিয়ারীলাল অকারণে অথবা কি কারণে কে জানে আপন মনে হাসতে লাগল।

ম্যারি কথাটা মনে থাকে পিয়ারীলালের। মিশনারী 'পুওর হোমে' থাকবার সময় স্যামসনকে ম্যারি করতে দেখেছে পিয়ারীলাল।

বেঁটে মোটা মতন দেখতে ছিল মেয়েটা। নাম ডায়না। স্যামসন আর ডায়না ছাথাপাথরের কাছে খাপরা-ছাওয়া বাড়িটায় থাকত। পাঁউরুটি বিক্রি করতে যেতো। স্যামসনের অসুখ হলে ডায়না কাঁদত; ডায়নার যখন ছেলে হল, হাসপাতালে স্যামসন পাগলের মত ঘর আর হাসপাতাল করে বেড়িয়েছে। ওরা একসঙ্গে গির্জেয় আসতো, বেড়াতে বেরুত মাঝে মাঝে। ক্রিষ্টমাসের সময় ওদের কাছে আসতো স্যামসনের বুড়িমা। সেই রাঁচির বুড়ি।

পিয়ারীলালের আপন বলতে সাতকুলে কেউ নেই। আসানসোলের রেলের লোকো অফিসে কাজ করে এ্যালফ্রেড। পিয়ারীলালের দূরসম্পর্কের এক খুড়তুতো ভাই। এ্যালফ্রেড বিয়ে করেছে। তার বউটা পিয়ারীলালকে একদিন অনেক কাঁদিয়েছে। ম্যারি করার পর পিয়ারীলাল তাকে একবার দেখে নেবে।

ম্যারির কথা ভাবতে বসে পিয়ারীলাল তন্ময় হয়ে উঠল। পঞ্চু সাহানাকে একদিন আমন্ত্রণ জানিয়ে বসল ও।

—বউ দেখতে কোথায় যেতে হবে, সাহেব; খাস বিলেতে না একেবারে সেই স্বর্গে?

—নো। হিঁয়া পর আ যাও। হাম তোম্‌কো দেখ্‌লায়গা।

—হিঁয়া পর—! কি সর্বনাশ, এই খাদের সামনে তুমি আমায় বউ দেখাবে? তারপর দু-চারটে ফষ্টিনষ্টি করে ফেলি, আর ছেলেটার চোখে পড়ে যাক্। ঝাঁটা জানতা হ্যায় সাহেব? সেই ঝাঁটার বাড়ি খেতে হবে তা হলে—।

—নো, হাম তোম্‌কো খিলায়গা পঞ্চা; ইউ কাম্।

পঞ্চু সাহানাও মজা পেয়ে বসল। কানাঘুষোয় শুনেছে ও— পিয়ারীলাল নাকি হারু গোমস্তার বাড়িতে আমদানি করা সুন্দরী একটা মেয়ের সঙ্গে হাসি-মস্করা করে। তাকে মাউথ অর্গান বাজিয়ে শোনায়। শিস্ দিয়ে ডাকে। এমনি কত কি। হারু গোমস্তার বাড়িতে সেই মেয়েটি যে কে, পঞ্চু তা জানে না। দেখে নি কোনদিন।

একদিন বেলা দশটা নাগাদ পাওয়ারহাউস থেকে কাজের ফাঁকে পালিয়ে এসে পঞ্চু সাহানা বললে—পিয়ারী, আজ তোমার বউ দেখবো।

পিয়ারীলালের মুখ গম্ভীর। চুপটি করে গালে হাত দিয়ে ও বসেছিল। তার গলায় ঝোলানো রূপোর ক্রস্‌টা মাঝে মাঝে হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরছে। পুরোপুরি গম্ভীর হয়েই পিয়ারীলাল বললে—নো।

—নো? অবাক হল পঞ্চু সাহানা, 'হোওয়াই নো, তুমি না আমার কাছে বাত্‌ দিয়েছ, সাহেব?'

পিয়ারীলাল পঞ্চুর দিকে সোজাভাবে তাকাল। কি ও দেখছিল কে জানে। একটু পরে করুণ মুখে পিয়ারীলাল বললে—'পঞ্চু, ডিয়ার হাম্‌কো পসান্দ নেহি করতি—!'

পঞ্চু সাহানা পিয়ারীলালের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। ওর গলার স্বর এমন আশ্চর্য চাপা আর হতাশা-ভরা, যা অন্তত পঞ্চু সাহানা কোনদিন শুনবে বলে আশা করে নি।

একটু ভেবে নিয়ে পঞ্চু বললে, 'তোমায় পছন্দ করে না? বলো কি সাহেব—, রংটাই যা কয়লার মত কালো তোমার। কিন্তু এমন কেষ্ট-কেষ্ট চেহারা।'

পঞ্চু সাহানা মিথ্যে বলে নি। পিয়ারীলালের রংটাই কালো, কিন্তু ওর পঁচিশ বছরের চেহারার দিকে তাকালে প্রশংসা না করে পারা যায় না। একটু লম্বা হলে কি হয়—ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত থাকে থাকে যেখানে যেমনটি মানায়, মাংসপেশী কেউ যেন সাজিয়ে মানিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। মুখটা ঈষৎ চ্যাপ্টা হলেও চোখের আভায় হাসি ছড়ান, ঠোঁট দুটো মোটা, পুরু গালে ভাঁজ পড়ে হাসলে। ভীষণ বোকা-বোকা দেখায় তখন।

পিয়ারীলালের মগজে বোধ হয় কল বিগড়েছিল। বললে পিয়ারীলাল—'দেখো, পঞ্চু—'

কথা শেষ না করেই পিয়ারীলাল পকেট থেকে একজোড়া ক্যারেট গোল্ডের হালকায়দার ইয়াররিং বের করে পঞ্চুর হাতে দিল। পঞ্চু ভূত দেখার মত অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল পিয়ারীলালের মুখের পানে চেয়ে।

—সাত রুপাইয়ামে মোলা হ্যায়। বাট্ ফর্‌নাথিং। ডার্লিং নেহি লিয়া! পিয়ারীর গলায় হতাশা আর ক্ষোভ।

হাতের বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পঞ্চু জবাব দিল—'তোমার গালে চাঁটি মেরে সাত-সাতটা টাকা ঠকিয়ে নিয়েছে পিয়ারীলাল। ওর দাম হওয়া উচিত ছ'টাকা। কিন্তু সাহেব ছ'টাকায় কি প্রেম জমে? একটু মোটারকম খসাও।'

পিয়ারীলাল পঞ্চুর হাত আর মুখের ভঙ্গি থেকে ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়ে সাগ্রহে প্রশ্ন করল, 'তোম্ বলো, পঞ্চু। ইউ আর মাই। ফ্রেণ্ড। ঘড়ি মোলেগা, কিয়া কুর্তি?'

পঞ্চু সাহানা এবার যেন বাস্তবিক একটু চটল। বললে—'তার চেয়ে তোমাদের মাসিপিসিরা পরে সেই বুককাটা একটা ফ্রক কিনে এনে দাও না! শালা বেহেড তো বেহেডই। একটা শাড়ি কিনে এনে দাও, সাহেব; বুঝলে, বেশ রঙচঙে শাড়ি।'

—অলরাইট।

পিয়ারীলালের মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল।

পঞ্চু সাহানার পরামর্শমত পিয়ারীলাল সেইদিনই বিকেলে সাইকেল চালিয়ে শহরে গেল। খুঁজে খুঁজে টকটকে লাল রঙের এক আলপাকার শাড়ি কিনল। আর কিনল এক-কৌটো পাউডার।

মধুবন ফিরতে সন্ধ্যে উতরে গেল পিয়ারীলালের। প্রথমে নিজের বাসায় এসে ভালো করে স্নান করল ও। তারপর সদ্য ধোপার বাড়ির পাট ভাঙ্গা এক ধুতি পরলো মালকোঁচা মেরে। কিছুদিন হল, পঞ্চুর কাছ থেকে ধুতি পরতে শিখেছে পিয়ারীলাল। গায়ে চড়ালো এক হাতকাটা ছিটের শার্ট। ভালো করে চুল আঁচড়ে মুখ ঘষল। তারপর বাইরে এসে পানের দোকান থেকে পান কিনে মুখে পুরলো।

সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে যখন তিন নম্বর পিটের সামনে এসে পৌঁছল পিয়ারীলাল, তখন শেষ আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ সন্ধ্যা অনেক ছড়িয়ে দিয়েছে। তিন নম্বর পিটের পাশ দিয়ে সরু একফালি পথ অন্ধকার গেছে মাঠের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে। সেই পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে এসে পিয়ারীলাল দাঁড়াল সুপারিনটেন্ডেণ্ট সাহেবের বাঙলোর পিছন দিকটায়। কাঁটাগাছের বেড়া দেওয়া কম্পাউণ্ড। একজায়গায় ছোট একটা তারের গেট্। তার পাশেই সুপারিন্টেন্ডেণ্ট সাহেবের চাকরবাকর থাকবার ধাওড়া।

পিয়ারীলাল আস্তে আস্তে গেট খুলে ভেতরে ঢুকল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে চুপিসারে এসে দাঁড়াল একটা জানালার কাছে। উঁকি মেরে দেখে, ইলেকট্রিক বাতির আলোয় মেঝেতে মাতুর ছড়িয়ে বসে হারু সিং আফিংয়ের নেশায় ঢুলে ঢুলে সুর করে কি যেন পড়ছে। সুরের টান আর ঢুলে পড়ার তাল মিলে সে এক মনোহর দৃশ্য।

হারু সিংয়ের বয়স হয়েছে। পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে। হাড় ওঠা চেটালো চেহারা। খালি গায়ে সাদা পৈতেটা কাঁধ থেকে কোল পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা। লম্বা নাকের পাশ দিয়ে ভাঙা গালের অর্ধেকটা চোখে পড়ে। ও হল কোলিয়ারীর গোমস্তা। শোনা যায়, হারু সিং গোমস্তাগিরি করে বাঁকড়োর দিকে বেশ জমিজমা করে ফেলেছে।

হারু সিং আগে থাকতো আট নম্বর পিটের কাছে। বছর তুয়েক হল, এসে ডেরা বেঁধেছে সুপারিন্টেন্ডেণ্ট সাহেবের সার্ভেণ্ট্স কোয়ার্টারে। তিন নম্বর পিটে কয়লা চুরি যাচ্ছিলো একসময়। হারু সিং সে চুরি বন্ধ করেছে।

দাঁড়িয়ে পিয়ারীলাল হারু সিংকে লক্ষ্য করলে খানিকক্ষণ। তারপর পাশের ঘরটার দিকে সরে এসে খোলা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ধীরে ডাকল, 'কুশল্লা।'

কোন সাড়া-শব্দ নেই। খানিকটা অপেক্ষা করে আবার ও ডাকল, 'কুশল্লা—।'

অন্ধকার ঘরে খস্‌খস্‌ করে কিসের একটা শব্দ হল। একটু পরে জানলার সামনে এসে দাঁড়াল কৌশল্যা। অন্ধকারে তাকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু দাগ-ধোয়া শ্লেটের গায়ের মত অস্পষ্ট একটা মুখ।

—বাজ সাহেব ?—অন্ধকারে চাপা একটা বিস্ময়-উক্তি।

—ইয়েস ডার্লিং। হাম। তোম গোসা কিয়া হ্যায়, কুশল্‌লা—?

কৌশল্যা নিরুত্তর। কী যেন ভাবছে সে।

একটু পরে খুব আস্তে কৌশল্যা বললে—'একটু দাঁড়াও সাহেব। উ ঘরটা দেখে নি একবার।'

পিয়ারীলাল কৌশল্যার জানালা থেকে সরে এলো হারু সিংয়ের জানালায়। লোকটার মুখ দিয়ে আর স্বর বেরুচ্ছে না—কেমন যেন বসে বসে গোঙাচ্ছে। কৌশল্যা এল সেই ঘরে। পিয়ারীলাল দেখল, কৌশল্যা এসে হারু সিংয়ের পাশে বসেছে। কৌশল্যার দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা পড়তে চায় না পিয়ারীলালের। হলদে রঙের লালপেড়ে শাড়ি পরনে। গায়ে দেহাতী খয়রা ছিটের আঁট জামা। আঁট করে খোঁপা বাঁধা। গলায় হাঁসুলী। রূপ বটে কৌশল্যার। আধ-ফরসা রঙ। আদল-কাটা মুখ। টানা-টানা কালো চোখ আর ঘন ভুরু। নগ্ন বাহু দুটো আলোয় ঘুমন্ত সাপের মতো এলিয়ে রয়েছে। কোমর বেঁকিয়ে, পা ছড়িয়ে বসেছে কৌশল্যা। সে ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরানো কঠিন।

কৌশল্যা হারু সিংয়ের গায়ে ঠেলা দিল।

সচকিত হয়ে চোখ চাইল হারু সিং। তারপর চোখ রগড়ে বিনা বাক্যব্যয়ে সামনের খোলা বইটার দিকে চোখ রেখে পড়তে লাগল ঃ

গৌতমে তপস্যা করে তমসার জলে।
হেনকালে ইন্দ্র গেলা গৌতমের ঘরে ॥
গৌতমের স্ত্রী হও এ পরম সুন্দরী।
বিধাতা এ সৃজিলেন স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥
রূপ দেখি ইন্দ্রদেব অচেতন কামে।
গৌতমের পাশে গেল গৌতম আশ্রমে ॥

হারু সিং সুর করে আগের মত পড়া শুরু করলেও কয়েক লাইন পড়তে পড়তে আবার ঢুলতে সুরু করে।

মাদুর ছেড়ে উঠল কৌশল্যা। ঘরের কোণ থেকে একটা বালিশ নামিয়ে পেতে দিল। ছোট্ট একটা কৌটো এনে হাতে দিল হারু সিংয়ের। বললে—'লাও! খুব হয়েছে। আর রামায়ণ পড়ে কাজ নাই।'

কৌশল্যা রামায়ণ তুলে রাখল। হারু সিং কৌটো খুলে আর এক গুলি আফিং মুখে পুরে মাদুরের ওপরেই শুয়ে পড়ল। বালিশটা মাথায় গুঁজে দিয়ে, বাতি নিভিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল কৌশল্যা। ঘরে নয়, একেবারে গেটের বাইরে এসে দাঁড়ালো। পাশে তার পিয়ারীলাল।

—বাজ সাহেব! কৌশল্যা পিয়ারীলাল বার্জকে বাজ সাহেব বলেই ডাকে।

—বলো কুশল্‌লা? পিয়ারীলাল সাগ্রহে উত্তর দেয়।

—তুমার উপর রাগ করি নাই, সাহেব।

—ইয়েস্। তুমারি বাস্তে কাপ্‌ড়া মোলা হ্যায় কুশল্। দেখো—।

কৌশল্যা কেন জানি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে।

—হাস্‌তি হ্যায়?

—তোমার বাক্যিতে নয়, সাহেব। আমার ভাগ্যির কথা ভেবে। তুমি যে খেষ্টান; রামায়ণ তো পড় নাই!

—কিয়া হ্যায় উসমে?

—কিয়া হ্যায়! আমি, তুমি—আমরা। কৌশল্যা মধুর গ্রীবাভঙ্গী করে পিয়ারীলালের বুকের দিকে মাথাটা বেঁকিয়ে দিল। গলায় তার তরল হাসি আর উত্তাপ, 'সবাই আছি, বাজ সাহেব। আমরা সবাই। তুমি ইন্দ্র; লয় কি?' কথার শেষে কৌশল্যা আবার খিলখিল করে হেসে উঠল, 'আমি অহল্যা।'

পিয়ারীলালের হাত থেকে শাড়ি আর পাউডার নিয়ে কৌশল্যা বললে, 'আর ক'দিন পরেই তো পুজা, জান তো বাজ সাহেব?'

—জরুর। থিয়েটার হোগা ক্লাবমে। হাম্‌ভি পার্ট করছি কুশল্‌। ইউ সি, কার্ভালো কা পার্ট। ডাকু, পাইরেট।

—তুমি ডাকাতই বটে, সাহেব।

কৌশল্যা আর দেরী করে না। পিয়ারীলালের জামাটায় আস্তে একটু গা-ছোঁয়া দিয়ে মিলিয়ে যায়।

আশ্বিন শেষ হল। এলো কার্তিক। প্রথম সপ্তাহেই পুজো। কোলিয়ারীর কাঁচা পয়সা। টাকার অভাব হয় না কোনো কালেই।

হাসপাতালের সামনে ধূমধাম করে প্রতিমা বসান হয়েছে প্রতিবারের মত। বিরাট পুজোপ্যাণ্ডেল। তার পাশে মেলা বসেছে। হরেক-রকম দোকান আর বাতি। পিয়ারীলালের নিঃশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না এ-ক'দিন। প্যাণ্ডেল সাজাতে, বাঁশ বেঁধে ষ্টেজ করতে, ইলেকট্রিক তার টেনেটেনে আলো ঝোলাতে আর পাঁচজনের মতন পিয়ারীলালও গলদঘর্ম হয়ে উঠল। একাই দশজনের হয়ে গতর দিয়ে খাটল ও।

সপ্তমী পুজোর সন্ধেয় প্রসাদ রুমালে বেঁধে পিয়ারীলাল এক ফাঁকে পালিয়ে এল কৌশল্যার কাছে। ক'দিন ধরে কৌশল্যার জ্বর।

পিয়ারীলাল যখন এল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌ সাহেবের সারা বাংলোটা তখন নিস্তব্ধ, চুপচাপ। সবাই গেছে ঠাকুর দেখতে।

আজ আর ভয় নেই। জানলায় এসে ডাকতে কৌশল্যা বিছানা ছেড়ে উঠে জানালা খুলে দিলে। জানালা টপকে ঘরে ঢুকল পিয়ারীলাল।

ক'দিনেই মুখ চোখ শুকিয়ে গেছে কৌশল্যার।

—তবিয়ৎ কেমন্‌ হ্যায়, কুশল্‌লা—? পিয়ারীলাল কৌশল্যার মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। কৌশল্যার সঙ্গে কথা বলতে পিয়ারীলাল আজকাল বাংলার আশ্রয় নেবার চেষ্টা করে।

—ভালোই। কৌশল্যা বিছানার ওপর বসতে বসতে বলল, 'তুমি বুঝি পুজা থেকে আসছো, সাহেব ?'

মাথা নাড়লো পিয়ারীলাল। পকেট থেকে রুমালে বাঁধা প্রসাদ বের করে এগিয়ে দিল কৌশল্যার দিকে।

—কি ?

—প্রসাদী। ফর্ ইউ। ব্লেসেড্ চিজ্। খা ল্যেও। বোখার ঠিক হো যায়গা।

কৌশল্যা পিয়ারীলালের প্রসাদ-ধরা হাতের দিকে তাকিয়ে পাথরের মত বসে থাকল।

হঠাৎ খেয়াল হল পিয়ারীলালের কৌশল্যার চোখের কোল দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

অবাক হল পিয়ারীলাল। হক্‌চকিয়ে গেছে ও। কি করবে বুঝতে না পেরে হাতের প্রসাদটা কৌশল্যার কাছে নামিয়ে রাখল। অস্বস্তিকর ভঙ্গীতে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে শেষ পর্যন্ত কৌশল্যার পায়ের কাছে বসে পড়ে বললে 'রোতি হ্যায় ক্যা! ডোণ্ট উইপ্!'

চোখের জল মুছল কৌশল্যা। পিয়ারীলালের দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে ধরা গলায় বললে, 'সাধ করে কাঁদি নাই; তোমার কাণ্ড দেখে কাঁদি, বাজসাহেব।'

কৌশল্যার হাসি-কান্নায় মেশা মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে পিয়ারীলাল।

কৌশল্যা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কি বোঝে কে জানে, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। মাটি থেকে তুলে নেয় প্রসাদের ছোট পুঁটলিটা।

—তুমি বড় বোকা, সাহেব!

পিয়ারীলালের ঘোর ভাঙে। উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'কাহে?'

প্রসাদের পুঁটলিটা দেখিয়ে কৌশল্যা বলে, 'এ সোহাগ ছাড়তে বুকটা কন্‌কনায়। কিন্তু—'

আশ্চর্য ভাবে হাসে কৌশল্যা। চোখের কোল ওর ভিজে এসেছে আবার। অনেক কষ্টে সামলে নেয় নিজেকে; বলে, 'তুমার

হাতের প্রসাদ খেলে আমার জাত যাবে, সাহেব। জাত লিতে চাও? লাও। তুমি যে ইন্দ্র, বাজসাহেব। ডাকাত। অহল্যার সব লিবে। লাও।'

কৌশল্যা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে।

হক্‌চকিয়ে যায় পিয়ারীলাল। কি করবে স্থির করতে না পেরে পিয়ারীলাল হঠাৎ কৌশল্যার হাত ধরে কাছে টেনে নেয়। পিয়ারীলালের বুকে মাথা রেখে কৌশল্যা বলে,—'আজ তুমি যাও, সাহেব। শরীলটা ভালো নাই। কাল এসো—'

—কা-ল?

—হাঁ! তোমার নাটুকে সাজটা পরে এসো! পার্ট তো দেখতে পারবো না—সাজটাই না হয় দেখিয়ো। কেমন?

—সার্টেন্‌লি নট্। মাগর তুমি রোও মাত, কুশল। হাম্‌কো—

পিয়ারীলালের মুখে হাত চাপা দেয় কৌশল্যা; জড়িত কণ্ঠে বলে —'কাল। আজ আর লয়।'

পিয়ারীলাল জানালা টপকে বাইরে এল। ফ্যাকাশে আলো পড়ে তিন নম্বর পিট্‌টা দূর থেকে কেমন যেন দেখাচ্ছে। পকেট থেকে মাউথ-অর্গান বের করে মুখে ঠেকাল পিয়ারীলাল।

থিয়েটার শেষ হতে তখনও অনেক দেরি।

পঞ্চু সাহানা হঠাৎ পিয়ারীলালকে আড়ালে ডেকে আনল। পঞ্চু সাহানার চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছে। নিশ্বাস নিচ্ছে দ্রুত।

—পার্ট তো তুমি খাসা ক'রছো, পিয়ারী। বইয়ের শেষ পর্যন্ত তোমার পার্টও রয়েছে। কিন্তু এদিকে যে বিপদ।

—কিয়া হুয়া হ্যায়? আই ক্যান্ কিল মানসিং—মাই কিং গিভ্ মি অর্ডার। পিয়ারীলালের মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে ভর ভর করে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি পারো। কিন্তু এদিকে যে সাংঘাতিক বিপদ পিয়ারী! পঞ্চু সাহানা ওকে আরো একটু আড়ালে টেনে আনলো। পকেট থেকে মদের বোতল বের করে দিলে।

—নাও, আর একটু টেনে নাও।

অনুরোধের প্রয়োজন ছিল না। পিয়ারীলাল বোতলটা নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে এক নিশ্বাসে যতোটা পারে গলায় ঢেলে নিল।

পঞ্চু সাহানা পিয়ারীলালকে দেখছিল। কার্ভালোর সাজে, পেণ্ট মুখে মেখে পিয়ারীলালকে বাস্তবিক সুন্দর দেখাচ্ছে। আর আশ্চর্য লোকটা পার্ট করছে চুটিয়ে।

মুখ মুছে পিয়ারীলাল বললে—'লেট ম্যাত কর, পঞ্চু। জল্‌দি বোলো।'

পঞ্চু দেখলো আর মুখ বন্ধ করে রাখা চলে না। প্রায় এক নিশ্বাসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে ও, 'তোমার কৌশল্যা বিবি তোমায় ডাকছে।'

—কুশল্? ইয়েস্। উ আয়ি হ্যায়? কাঁহা হয় কুশল্?

—হাসপাতালে।

পিয়ারীলাল পঞ্চুর দিকে সোজা চোখে তাকায়।

—হাসপাতালেই এসেছে পিয়ারী। ওর পেটে বাচ্চা ছিল। কেমন করে না জানি পড়ে গিয়ে সাংঘাতিক কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছে। রক্তারক্তি ব্যাপার। বাঁচবে না বোধ হয়। গাড়িতে করে একটু আগে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে, হারু সিং।

—খুন? পিয়ারীলালের সমস্ত মুখে উদ্বেগ আর আশংকা।

—তোমার নাম করে ডাকছে। একবার যাও।

পিয়ারীলাল চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ পঞ্চু সাহানা ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'কৌশল্যার পেটের ছেলেটা কার? তোমার নাকি সাহেব?

পিয়ারীলাল মাথা নাড়লো। না।

—খুব সাবধান পিয়ারী। হারু সিং পুলিশ আনিয়েছে। যা-তা একটা কিছু করে বোসো না।

হাসপাতালে এসে পিয়ারীলাল দেখে লেবার রুম থেকে খানিক আগে কৌশল্যাকে এনে আলাদা ঘরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে।

বারান্দায় কয়েকজনের ভিড় রয়েছে তখনো। ডাক্তারবাবু, হারু সিং, পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার, সেনগুপ্ত সাহেব।

পিয়ারীলাল কাছে আসতে ডাক্তারবাবু ওকে কাছে ডাকলেন, 'ইউ লাইক্ টু মিট্ হার?'

—ইয়েস, স্যার। পিয়ারীলাল স্যালুট ঠুকে কার্ভালোর কায়দায় দাঁড়াল। কোমরের পাশে বাঁধা তলোয়ারটা ঝুলছে।

—ইউ ক্যান্ গো। বাট্ ডোণ্ট ডিষ্টার্ব।

পিয়ারীলালের পা টলছিল। ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল ও। বিছানার মধ্যে চোখ বন্ধ করে পড়ে রয়েছে কৌশল্যা। আস্তে আস্তে কৌশল্যার পাশে এসে পিয়ারীলাল ডাকে 'কুশল্—'

কৌশল্যা যেন চোখ বন্ধ করে অপেক্ষা করছিল এই ডাকটুকু শোনবার আশায়। ওর কানে পিয়ারীলালের দেওয়া সেই ক্যারেট-গোল্ডের ইয়াররিং ছুটো ঝুলছে। চোখ মেলে তাকালো কৌশল্যা।

ঘরের ফিকে সবুজ আলোয় কার্ভালোর সাজপরা পিয়ারীলালের দিকে তাকিয়ে কৌশল্যার নিস্তেজ চোখের পাতা ছুটো খোলাই থাকল। খানিক পরে ক্ষীণস্বরে কৌশল্যা ডাকল, 'বাজসাহেব—'

পিয়ারীলাল কৌশল্যার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে। 'মাই কুইন্; গিভ্ মি অর্ডার।'

কৌশল্যার চোখের জলে গাল ভেসে যাচ্ছে। পিয়ারীলালের হাতটা টেনে নিয়ে কৌশল্যা বললে, 'তুমায় কি সুন্দর দেখাচ্ছে বাজসাহেব। তুমি বুঝি রাজার পার্ট করছো?'

—নো। কম্যাণ্ডার। কুশল্—তুমার ল্যাড়কা কাঁহা?

অতো কষ্টেও কৌশল্যার হাসি পেল। চোখের জলে সে হাসি মুছে বললে,—'আছে'।

—ডোণ্ট্ উইপ্। পিয়ারীলাল কৌশল্যার মাথায় হাত রাখল। বলার আর কিছু ছিল না তার।

বাইরে আসতে হারু সিংয়ের চ্যালা কেষ্ট মাইতি পিয়ারীলালের হাতটা চেপে ধরল—শালা দোআঁশলার জাত! ডাক্তারবাবুর ঘর

থেকে একবার ঘুরে এসে তারপর দেখাচ্ছি তোমায়। জান্ নিয়ে নেবো আজ।

পিয়ারীলাল এক ধাক্কায় কেষ্ট মাইতিকে ছিটকে ফেলে দিয়ে গট্‌মট্ করে ডাক্তারবাবুর ঘরে ঢুকল।

ডাক্তারবাবুর ঘরে ঢুকে স্যালুট ঠুকে দাঁড়ায় পিয়ারীলাল। কি কথা হচ্ছিল কে জানে। সবাই চুপ করে যায়।

পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার ঘরের কোণে রাখা কাগজে মোড়া ভিজে একটা লাল শাড়ির দিকে ইঙ্গিত করেন—এহি কাপড়া কোন্‌কা ?

—কুশল্‌কা।

—তোমকো মালুম হ্যায় ?

—ইয়েস। আই গেভ হার।

—তুম্ ওই জানানাকো ঘরমে যাতা থা ?

—ইয়েস।

—কাহে ?

—আই লাভ হার। পিয়ার করতা হ্যায় উসকো।

—সোয়াইন। পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার দাঁতে দাঁত চেপে গর্জন করেন।

—কৌশল্যা তোমার কে, পিয়ারীলাল ? সেনগুপ্ত সাহেব প্রশ্ন করলেন।

—সি ইজ্ মাই—কথার মাঝপথে হঠাৎ থেমে গেল পিয়ারীলাল।

ডাক্তারবাবু এবার বললেন, 'সি ওয়াজ্ প্রেগন্যাণ্ট —লড়্‌কা হোনে বালি থি—ইউ নো হ্যাট্ বার্জ ?'

—ইয়েস।

—তুমি জানো পিয়ারীলাল, কৌশল্যা হিন্দু। হারু সিং ওকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসে নিজের কাছে রেখেছিল। সি ইজ উইডো। হারু সিং ওর ধর্মবাবা।

—নো। নেহি জানতা হ্যায়। পিয়ারীলাল এবার চটে উঠেছে।

—ইউ টেল্ মি বার্জ, হুজ্ চাইল্ড ইজ্ ছাট্—? ডাক্তারবাবু বললেন, 'কৌশল্যার পেটের ছেলেটা কার ?'

এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল বার্জ—পিয়ারীলাল বার্জ। তারপর বললে, 'মাই সান। হ্যামকো বেবি।'

পরের দিন সকালে তিন নম্বর পিটের সামনে পড়ে থাকতে দেখা গেলো পিয়ারীলালকে। মাথা ফাটা, মুখে চোখে রক্ত জমে একাকার হয়ে রয়েছে। নিজের জায়গাটিতে টিনের শেডের তলায় পিয়ারীলাল মুখ থুবড়ে পড়েছিল। ওর গায়ের কার্ভালোর সাজ ছেঁড়া। তলোয়ারটা পড়ে রয়েছে দূরে।

পঞ্চু সাহানা সকাল বেলায় খোঁজ করতে এসে ওকে দেখল। জল এনে মুখের রক্ত পরিস্কার করতে বসলো; কোলের উপর টেনে নিল পিয়ারীলালের মাথা।

চোখ খুলে চাইল পিয়ারীলাল। সকালের আলোয় প্রথমেই চোখে পড়ল পঞ্চুর মুখ।

পঞ্চু বললে, 'তোকে বুঝি কাল একা পেয়ে মেরেছে, পিয়ারী ?

পিয়ারী মাথা নাড়ল।

দাঁতে দাঁত চেপে বললে পঞ্চু, 'আচ্ছা শালা হারু সিংকে আমিও দেখে নেবো।' কথাটা বলে হঠাৎ পঞ্চুর মনে পড়ল হারু সিং কাল রাত্রেই পালিয়েছে।

পঞ্চু সাহানা আবার বললে, গলায় তার বিদ্রূপ, 'জানিস পিয়ারী, হারু সিং পালিয়েছে।'

পিয়ারীলাল অবাক হয় না। শুধু বলে, 'ভাগা হ্যায় ?'

পঞ্চু জোরে মাথা নাড়ে। বলে, 'ভাগবে না তো কি ? শালা বুড়ো এতদিন খুব ধর্মবাবা সেজে মজা লুঠছিল। এবার চম্পট্। কৌশল্যা সব ফাঁস করে দিয়েছে।'

পঞ্চু হারু সিংয়ের উদ্দেশ্যে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয়। পিয়ারীলাল বলে, 'ড্যাম্ ইট্। পঞ্চু, কুশল্—?'

—হাসপাতালে ভাল আছে। বাচ্চাটাও।

পঞ্চুর কাঁধ ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে চলে পিয়ারীলাল তিন নম্বর পিটের সামনে দিয়ে। চলতে চলতে এক জায়গায় থমকে দাঁড়ায় পঞ্চু। মাটি থেকে পিয়ারীলালের মাউথ-অর্গানটা কুড়িয়ে নেয়। ওর হাতে দিয়ে বলে, 'তোর বাঁশি।'

পকেটে রেখে দেয় পিয়ারী। আরো কয়েক পা এগিয়ে পিয়ারীলাল বললে,—'পঞ্চু, হাম হিঁয়া পর নেহি রহেগা।'

—আমিও তাই বলি। এখানে তোর অন্ন জুটবে কিন্তু ইজ্জত আর জুটবে না।

—ঠিক বাত হ্যায় পঞ্চু। হাম্‌কো ইজ্জাত ছোড়ো; বাট কুশল্‌?

—কি করবি কৌশল্যাকে নিয়ে?

—হামকা সাথ লে যায়গা।

নীরবে পিয়ারীলাল পঞ্চুর গলা জড়িয়ে খানিকটা পথ হেঁটে এসে হঠাৎ হেসে ওঠে। পঞ্চু সাহানা অবাক হয়।

—হাসছিস্‌ কেন?

—পঞ্চু, হাম এক্‌লা মধুবনমে আয়া থা। নাউ উই আর থ্রি—তিন আদমী। হাম—হামকো কুশল্‌, আউর হামকা ল্যাড়্‌কা! পিয়ারীলাল আশ্চর্য সুন্দর হয়ে হাসে।

পঞ্চু বুঝি অসতর্ক মুহূর্তে একটু চমকে উঠল, 'তোর ল্যাড়্‌কা? ও, হ্যাঁ তোরই তো। তোদেরই তো!'

মশা

শুনলে আপনারা অবাক হবেন। আমিও হয়েছিলাম। ধারণা ছিল না আমার, এমন কোনও মানুষ থাকতে পারে, এমন অদ্ভুত এক মানুষ—মশার কামড় খেতে যে ভালবাসে।

লোকটার নাম ছিল চন্দ্রকান্ত। চন্দ্রকান্ত ঘটক। ওকে দেখে বয়স ঠাহর করা মুশকিল। দেখে আমার মনে হয়েছিল, চল্লিশ। কিন্তু চন্দ্রকান্ত বলেছিল, তার বয়স চৌত্রিশ। খুব বেঁটে না হলেও চন্দ্রকান্ত খাটো মানুষ। মাংসের চেয়ে গায়ে হাড় বেশী। রং কালো, মুখটা গোল। কপালে কাটা দাগ। চোখ ছুটো ছোট ছোট, নাক বসা। নীচের ঠোঁট অসম্ভব পুরু—খানিকটা ঝুলে থাকে। চোয়ালের হাড় চেটালো। গালে এক গভীর ক্ষতচিহ্ন, মাথার চুল কুচকুচে কালো আর কোঁকড়ানো। গলায় তুলসীর মালা।

চন্দ্রকান্তকে আমি প্রথম দেখি হাসপাতালে।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের হাসপাতালের ডাক্তার আমি। সোনাপুরে বদলী হয়ে সবে এসেছি; হাসপাতালটা মাঠের মধ্যে—চারাপাশে তেঁতুল আর অশ্বত্থ গাছ। তিন-কামরার হাসপাতাল। বাড়িটা করবীর ঝোপে ঘেরা। পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে আমার খাপরা-ছাওয়া বাসা। আর একপাশে কম্পাউণ্ডার যামিনীবাবুর।

একদিন, সেটা বোধ হয় গরমের গোড়াতেই হবে, বাসার ফাঁকা বারান্দায় বসে তাশ খেলছি, এমন সময় একটা লোক এসে সামনে দাঁড়াল।

যামিনীবাবু তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি হে, চন্দ্রকান্ত যে! কি খবর?'

গায়ে একটা চাদর চাপিয়ে এসেছিল চন্দ্রকান্ত। বেশ হাঁপাচ্ছে। চোখ দুটো লণ্ঠনের আলোয় ভাল ক'রে ঠাহর করা গেল না। তবু মনে হল, বেশ স্বাভাবিক নয়।

—ব্যথা। চন্দ্রকান্ত সারা মুখ বিকৃত ক'রে বললে, 'আর জ্বর।'

—কখন জ্বর এলো? যামিনীবাবু তাশ ভাঁজতে ভাঁজতে বললেন। অন্য দুজন নস্যি ঝাড়ছে তখন, আর হাতের দান চালা নিয়ে তর্ক বাঁধিয়েছে।

আমার মনে হল, চন্দ্রকান্তর কথায় কেউ যেন ভ্রূক্ষেপ করলে না।

—সকাল থেকেই। চন্দ্রকান্ত মাটিতে বসে পড়ল, 'একটু জল খাওয়াবেন, কম্পাউণ্ডারবাবু?'

লণ্ঠনের আলোয় দেখলুম, লোকটা হাঁপাচ্ছে। চোখ লাল। সমস্ত মুখখানা শুকনো, অস্বস্তির বিকৃতি জড়ানো।

জল আনতে বললুম আমি।

—জ্বর এসেছে সকালে, এতক্ষণ কি করছিলেন? বিরক্ত হয়ে আমি বলি।

চন্দ্রকান্ত আমার দিকে তাকায়। কথা বলে না।

জবাব দেন যামিনীবাবু। বলেন, 'এতক্ষণ বোধ হয় বসে বসে মশার কামড় খাচ্ছিল। না কি, প্রভু?'

কথাটা প্রথমে বুঝি নি। যামিনীবাবু বুঝিয়ে দিলেন। 'মশার কামড় খেয়ে খেয়ে ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, আরও কত কি যে ও পুষে রেখেছে শরীরে, ডাক্তারবাবু, তার কোন হিসেব নেই।'

চমৎকৃত এবং স্তম্ভিত হয়েছিলাম। কিন্তু তার চেয়েও দরকার ছিল লোকটাকে একবার দেখা। জল খেয়ে একটু যেন স্বস্তিও পেয়েছিল চন্দ্রকান্ত।

বাইরের ঘরে বেঞ্চির ওপর শুইয়ে স্টেথস্কোপ বসাতে হল ওর বুকে পিঠে। নাড়ি টিপতে হল। বুকের শব্দটা খারাপ। শ্লেষ্মা জমেছে প্রচুর পরিমাণে। জ্বরটা বোধ হয় সে কারণেই।

বললাম' 'অবস্থা তো ভালো নয়! এমন শরীর নিয়ে এই রাত্রে হেঁটে এলেন? সকালে কি করছিলেন? একটা টাকা না হয় ভিজিট দিয়ে তলবই করতেন একবার!'

গায়ের মোটা চাদরটা জড়িয়ে ও হাত জোড় করলে। বললে, 'আমায় আপনি বলবেন না, ডাক্তারবাবু। আমি আপনার থেকে বয়সে ছোট, সম্মানেও ছোট—সামান্য লোক।'

বিনয় দেখবার মতন সময় ছিল না। প্রেসক্রুপশন লিখছিলাম। কথাটা কানে গেল। বলতে কি, চন্দ্রকান্তকে তুমি বলতে পারার সুযোগ পেয়ে স্বস্তি পেলাম।

তাশ ফেলে যামিনীবাবুকে হাসপাতালে যেতে হল চন্দ্রকান্তর ওষুধ তৈরী করতে। অসন্তুষ্ট হয়েছেন যামিনীবাবু; বুঝতে পারলুম। কিন্তু উপায় ছিল না।

চন্দ্রকান্তকে বললুম, 'ওষুধটা ঠিকমত খেও। সাবধান, ঠাণ্ডা লাগিও না; আর ভারি জিনিস কিছু খাবে না। কালকেই খবর পাঠিও, কেমন থাকো।'

চন্দ্রকান্ত চলে গেল।

তাশ টানতে টানতে কেমন যেন কৌতূহল বশতই প্রশ্ন করলাম, 'লোকটা কি সত্যি সত্যিই মশার কামড় খায়?'

—খায় মানে! বিপিন মিত্র বললে, 'মশার কামড় খাবার জন্যে রেগুলার মশার চাষ করছে!'

—বলো কি? অপরিসীম বিস্ময়ে বললাম। তখনও মনে হচ্ছিল, ওরা আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে।

—বলবো আবার কি! যেও না একদিন ওর বাড়িতে—সন্ধ্যে ক'রেই যেও, তা হলে কথাটা আরও ভালো বুঝতে পারবে।

পরের দিন চন্দ্রকান্ত যে আসতে পারবে না হাসপাতালে, তা আমি জানতুম। কোন মানুষের পক্ষে তা সম্ভব না। তবে আশা করেছিলাম, একটা খবর পাঠাবে। খবর পাঠানোর প্রয়োজন ছিল।

ওর বুকের যেরকম অবস্থা দেখেছি, তাতে আর একটু এদিক-ওদিক হলেই ফলটা মারাত্মক দাঁড়াতে পারে।

কিন্তু চন্দ্রকান্ত এল না। বিকেলে সাধারণত—সামান্য কাজ শেষ ক'রেও—ডিস্‌পেন্‌সারির বাইরে চেয়ার বের ক'রে আমি সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে থাকি। কেউ এলে ফেরত যায় না।

মনে যথেষ্ট অস্বস্তি এবং আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। কি জানি কেন, চন্দ্রকান্তকে দেখে এবং তার সম্পর্কে দু-একটি মন্তব্য শুনে লোকটি সম্পর্কে আমার কেমন এক কৌতূহল জেগেছিল। খানিকটা দুর্বলতাও বোধ হয়।

চন্দ্রকান্ত লোক পাঠাল না। সন্ধ্যে উৎরে গেল। বাসায় ফিরে গেলাম।

পরের দিনও বিকেল পর্যন্ত কেউ এলো না চন্দ্রকান্তর খবর নিয়ে। ঠিক বলতে পারব না কেন, তবে আমার মনে অস্বস্তিটা বেড়ে উঠল। সন্দেহ হচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত লোকটা জটিলতর ব্যধি বাধিয়ে বসে আছে। আর হয়তো তার অবস্থা এমন নয় যে, সামান্য একটি টাকা দিয়ে আমায় তলব করতে পারে তার বাড়িতে।

কি ভেবে যামিনীবাবুর কাছ থেকে চন্দ্রকান্তর বাড়ির নিশানা জেনে নিয়ে সন্ধ্যের মুখে বেরিয়ে পড়লাম।

চন্দ্রকান্তর বাড়ি খুঁজতে বেগ পেতে হয় নি আমায়। ধোপাপুকুরের পশ্চিমে চন্দ্রকান্তর বাড়ি। ঝোপ-ঝাড় আর ডোবার মধ্যে মাটির খাপরা-ছাওয়া একটা পায়রার খোপের মতন ঘর। সমস্ত পরিবেশটা যেমন নোংরা তেমনি স্যাঁতসেঁতে। ঘরে বোধ হয় একটা লণ্ঠন জ্বলছিল। সামান্য একটু আলোর আভাস দেখতে পেলুম।

ডাকলুম, 'চন্দ্রকান্ত!'

প্রথম ডাকে সাড়া নেই। দুবার—তিনবার।

শেষ ডাকে সাড়া পাওয়া গেল। ঘরের মধ্যে থেকে নয়, বাড়ির পিছন দিক থেকে চন্দ্রকান্ত বেরিয়ে এল। অন্ধকার সে মূর্তি দেখলে

আঁতকে ওঠা আশ্চর্য নয়। মাথা গা চাদরে মুড়ি দিয়ে যেন কাঁপতে কাঁপতে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কাছে এসে দাঁড়াল চন্দ্রকান্ত।

আমায় দেখবে, আশা করে নি ও। আমিও আশা করি নি, আমার রুগীকে এ অবস্থায় দেখব।

—ডাক্তারবাবু, আপনি!

—আমিই তো। কি খবর তোমার? বাইরে কোথায় গিয়েছিলে?

চন্দ্রকান্ত সে কথার কোন জবাব না দিয়ে তার ঘরের ভেজানো দরজা খুলতে খুলতে বলল, 'আসুন, ডাক্তারবাবু।'

ঘরের মধ্যে ঢুকে মনে হল, এর চেয়ে জঘন্যতম স্থানে জীবনে কখনও যাই নি।

ছোট ঘর। হ্যারিকেনের টিমটিমে আলো। ঘরের চারপাশে স্তূপীকৃত জঞ্জাল। একদিকে মাটির কলসী, টিন, বস্তা—আর একদিকে যত রাজ্যের ছেঁড়াখোঁড়া, বিছানা মাদুর। অন্য পাশে ততোধিক আবর্জনা–ডাঁই করে রাখা কাঠ, খড়, শুকনো গাছের ডালপালা—এমনি কত কি বিচিত্র জিনিস।

দম আটকে আসছিল। বললাম, 'এই ঘরে তুমি থাকো?'

প্রশ্নটা অনর্থক। কেননা, চন্দ্রকান্তর চিট-ময়লা বিছানাটা ঘরের একপাশে দেখতে পাচ্ছিলাম—তার চাদর, জামা, ধুতিও ঝুলছিল দড়িতে।

চন্দ্রকান্ত মাথা নাড়ল।

আমি আশেপাশে তাকাচ্ছিলাম—ঘরটার জানালা-টানলা আছে কিনা, দেখছিলাম। ওদিকে ঘরের মধ্যে পা দিয়েই অজস্র মশার একটানা একটা ভোঁ ভোঁ ডাক কানের কাছে শুনতে পাচ্ছি। ইতোমধ্যে খোলা হাতে দু-চারটে কামড় খেয়েছি। জ্বালা করছিল হাত দুটো। ওদিকে অসহ্য গরম। ভীষণভাবে ঘামতে সুরু করেছি।

—জানলা-টানলা থাকে তো খোলো দেখি নি! এস্—!

চন্দ্রকান্ত জানলা খুলে দিল। একটা দুর্গন্ধ ভেসে এল। পচা ডেবোর গন্ধ। লণ্ঠনটা যথাসম্ভব বাড়িয়ে দিলে। কোথা থেকে একটা পাখা এনে আমায় হাওয়া করতে লাগল।

—কেমন আছো তুমি ? আর তো গেলে না !

চন্দ্রকান্ত বিছানার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'বসুন, ডাক্তারবাবু।'

বসার ইচ্ছে আর ছিল না ; ঘরটা থেকে বেরুতে পারলে যেন বাঁচি। তবু চন্দ্রকান্ত এমনভাবে বলল যে, একটু অন্তত না বসে যাওয়ার উপায় নেই।

বিছানায় বসতে গিয়ে দেখি—কালো কাপড়ে বিছানাটা ঢাকা। পাশেই একটা মোড়ার ওপর তেমনি কালো এক কম্বল।

—কেমন আছ তুমি ?

—তেমনিই, ডাক্তারবাবু।

—খবর পাঠাও নি কেন ?

—টোটকা করছিলাম। একলা লোক খবর পাঠাতে পারি নি, যেতেও পারি নি। বুকের ব্যথাটা অল্প কমেছে।

বিরক্ত হবারই কথা। ওষুধ খেলো আমার কাছে, এদিকে আবার টোটকা। কিন্তু বিরক্ত হলাম না। চন্দ্রকান্ত সহজভাবেই সত্যি কথাটা বলেছে।

—একলা লোক মানে ? বাড়িতে কেউ নেই তোমার ?

—না।

—চেনা-জানা লোক দিয়েও তো খবর পাঠাতে পারতে। ওষুধ বদলে দিতাম।

—চেনা লোক ! কেমন একটা উদাস টান দিয়ে বললে চন্দ্রকান্ত।

আর অপেক্ষা করার মতন অবস্থা ছিল না—মশার কামড়ে হাতে যেন লঙ্কাবাটার জ্বলন। মুখে গালে ঘাড়েও কামড় খেয়েছি কয়েকটা —যদিও চন্দ্রকান্ত সমানে বাতাস করছে। বললাম, 'শোও তাড়াতাড়ি একবার, দেখে নি।

একটু ইতস্তত ক'রে চন্দ্রকান্ত বিছানায় শুয়ে পড়ল।

শ্লেষ্মাটা খানিক পাতলা হয়েছে ঠিকই।

—তা হলে চন্দ্রকান্ত, টোটকাই করবে, না, ওষুধ খাবে আমার ?

--আজ্ঞে পেলে তো ওষুধই খাই। কিন্তু আপনি হাসপাতাল যেতে নিষেধ করলেন সেদিন।

—একবার খবরটা দিয়ে আসার মত কেউ নেই? কাউকে পাঠাতে পারো না? উঠতে উঠতে বললুম।

চন্দ্রকান্ত নীরবে মাথা নাড়ল।

বাইরে বেরিয়ে এসে বললাম, 'তুমি এই শরীরে বাইরে কোথায় গিয়েছিলে, চন্দ্রকান্ত?'

— আজ্ঞে, ওই ঘরের পেছনদিকে ছিলাম।

—মশার কামড় খাচ্ছিলে? হাসতে হাসতে বললুম।

—আপনিও জানেন! চন্দ্রকান্ত যেন চমকে উঠল।

—জানি। তা বাইরে কেন হে, ঘরের ভিতরটায় যা অবস্থা করেছ, তাতেই তো চলতে পারে।

চন্দ্রকান্ত চুপ। আর কোন কথা বলল না ও।

বাড়ির পথে পা বাড়িয়ে সারাটা রাস্তা ওর কথাই ভাবলাম। হাসির কথা নয়, সত্যিই লোকটা মশার কামড় খাবার জন্যে মশার চাষ করছে। অদ্ভুত কাণ্ড!

কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল হয়েছিল। খুব সম্ভবত চন্দ্রকান্তর অসাবধানতার জন্যেই। রোগটা হঠাৎ বাঁকা পথ নিল।

আমার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড হাসপাতালের তিনটি কামরা। একটি আমার, একটি ওষুধ তৈরি করবার, আর একটি টানা বারান্দার শেষে। সে ঘরখানা অপারেশন করার জন্য; কিন্তু বহুকাল থেকে সেটা এমনিই পড়ে আছে। দূর জায়গা থেকে তেমন মারাত্মক কোন রুগী এলে ওই ঘরটিতে তাকে রাখা হতো কখনো-সখনো।

খালি ছিল ঘরটা। চন্দ্রকান্তকে বললুম, 'হাসপাতালে চল।'

ভীষণভাবে মাথা নাড়া দিয়ে উঠল চন্দ্রকান্ত। জ্বরের যন্ত্রণায় তার মুখখানি এমনিতেই বিরক্ত ভরা; তার ওপর যেভাবে সারা

মুখ বিকৃত ক'রে মাথা নাড়া দিলে, তাতে অত্যন্ত কুৎসিত দেখাল সেই মুখ।

বললাম, 'কিন্তু এভাবে থাকলে তোমায় দেখবে কে? আমার পক্ষেও যে মুশকিল।'

চন্দ্রকান্ত কপাল দেখাল। অর্থাৎ ভাগ্যে যদি থাকে, সে বাঁচবে। না হয় মরবে।

—এ ঘরে থাকলে কিছুতেই তোমার রোগ সারবে না।

—না সারুক! এ ঘর ছেড়ে যেতে পারব না, ডাক্তারবাবু!

— কি আছে তোমার এ ঘরে? বিরক্ত হয়ে উঠি আমি।

চন্দ্রকান্ত নিরুত্তর।

বুঝেছিলাম, ওকে হাসপাতালে আনানো যাবে না। প্রস্তাব করলাম, 'ঘরটাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়ে নাও অন্তত।'

চন্দ্রকান্ত তাতেও রাজি নয়। বিষণ্ণ একটা হাসি হাসে আমার কথায়। বলে, 'তা হলে ঘুম হবে না রাত্রে।'

—মশার কামড় না খেলে তোমার ঘুম হয় না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। নির্বিকার কণ্ঠে ও বলল।

—আজব কাণ্ড! আমাদের তো শরীর জ্বলে যায়—চুলকে চুলকে গায়ের ছাল উঠিয়ে ফেলি। তোমার অত কি আরাম মশার কামড়ে, বুঝি না।

সজ্ঞানে আনতে পারি নি চন্দ্রকান্তকে—যখন বাড়াবাড়ি অবস্থায় জ্বরের ঘোরে ও বেহুঁশ, ভুল বকছে, মানুষ চিনতে পারছে না—তখনই কোনরকমে ওকে হাসপাতালে এনে তুলেছিলাম।

আর সেইদিনই মাঝরাতে প্রথম শুনলাম সৌদামিনীর নাম। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ। বারবার সেই এক নাম—সৌদামিনী, সৌদামিনী। কে সৌদামিনী; তা স্পষ্ট বুঝি নি।

বিক্ষিপ্ত প্রলাপের মধ্যে আর একটি কথার বারবার পুনারাবৃত্তি করেছে চন্দ্রকান্ত—জেলখানা। জেলখানার কথা বলছিল ও বিড়বিড় ক'রে। ভয়ে চমকে চমকে উঠছিল।

ও যে বাঁচবে, সে আশা সত্যিই আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু কি জানি কেন, কেমন একটা রোখ চেপে গিয়েছিল। না বাঁচে, না বাঁচুক—তবে আমিও সহজে ছাড়ব না। আমার আয়ত্তে যতটুকু জ্ঞান আছে, তার প্রয়োগ করে যাব শেষ পর্যন্ত।

হাসপাতালে আনার চার দিনের দিন যেন একটু আলোর আভাস দেখলুম। একটু আশা হল।

সেদিন নিঝুম হয়ে পড়েছিল চন্দ্রকান্ত ; জ্ঞান ফিরে পেলেও ওর অনুভূতি স্পষ্ট ছিল না।

পরের দিন স্পষ্ট ক'রে তাকাতে পারল চন্দ্রকান্ত, বুঝতে পারল।

—কি হে, বাড়ি যাবে নাকি ? হেসে বললুম।

মাথা নাড়ল চন্দ্রকান্ত। হ্যাঁ, যাবে।

বললুম, 'আরো কটা দিন থেকে যেতে হবে, বুঝলে! কাণ্ড যা বাধিয়েছিলে—আর বাড়ি ফিরতে হতো না!'

চন্দ্রকান্ত শুধু বোকার মতন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থাকল।

সেদিন আর কোন কথা তুলি নি। পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় তার ঘরে বসে ছিলাম। বাইরে কালবৈশাখীর ঝড় থেমে বৃষ্টি সুরু হয়েছে। ঠাণ্ডা একটা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালের মাঠে তেঁতুলগাছের পাতা তখনও সমানে কাঁপছে, নুয়ে পড়ছে অশ্বত্থের ডাল। করবী ঝোপের পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে, আর অদ্ভুত এক শব্দ তুলছে।

চন্দ্রকান্ত চুপটি করে শুয়েছিল। আমিই কথা শুরু করলাম।

—সৌদামিনী তোমার কে, চন্দ্রকান্ত ?

চমকে উঠে চন্দ্রকান্ত আমার দিকে তাকাল। তারপর তাকিয়ে থাকল এমন-ভাবে, যেন পাথরের দুটি চোখ চেয়ে আছে।

সে দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম আমি। প্রশ্ন করাটা হয়তো উচিত হয় নি।

এমনিভাবে কেটে গেল কিছু সময়। শেষে চন্দ্রকান্ত বললে, 'আপনি কি তাকে দেখেছেন, ডাক্তারবাবু ?'

—আমি ? না, আমি কোথা থেকে দেখব !

চন্দ্রকান্ত প্রশ্নার্ত ও বিস্ময়সূচক দৃষ্টিতে এবার তাকাল।

বললাম, 'জ্বরের ঘোরে তুমি সৌদামিনীর নাম বলছিলে।'

—আর কি বলেছি ডাক্তারবাবু? ভয়ে ভয়ে যেন বলল চন্দ্রকান্ত।

বললাম, যা যা ও বলেছে। সেই অসংলগ্ন, অর্থহীন বিকার।

চন্দ্রকান্ত শুনে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকল। তারপর বললে, 'কেউ জানে না, ডাক্তারবাবু। কাউকে জানাই নি। আপনাকে বলবো। শুনে ফেলেছেনই যখন…।'

—দরকার কি আমাকে বলার—তেমন যদি কোন কথা হয়!

—না, না। আপনি আমায় ভালোবাসেন, ডাক্তারবাবু। জীবন বাঁচিয়েছেন। আপনাকে বিশ্বাস না করলে পাপ হবে।

চন্দ্রকান্ত নিজেকে একটু সুস্থির করে ক'রে নিয়ে বলল, 'সৌদামিনী আমার বউ, ডাক্তারবাবু। আমার যখন বাইশ বছর বয়েস, তখন ওকে বিয়ে করি। ষোলো বছরের ডাগর মেয়ে। পটের মত দেখতে ছিল। যেমন গড়ন, তেমনি চুল, চোখ, নাক। রং ছিল মাজা।

আমাদের বিয়ের বছর তুই পরে—আমার শালির বিয়ে হয়। তার নাম পদ্ম। সৌদামিনীর চেয়েও সুন্দরী ছিল পদ্ম। পদ্মর বিয়ের দিন শেষরাতে পদ্মর স্বামীকে বাসরঘর থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায় কারা—ওর বাপ ওকে ডাকছে এই ছুতোয়। বরযাত্রীরা ছিল কনের বাড়ি থেকে প্রায় সিকি মাইলটাক দূরে আমার খুড়শ্বশুরের বাড়িতে। এই তুই বাড়ির পথে পড়ত এক বাগান। পদ্মর বরকে এই বাগানে সড়কি দিয়ে কারা যেন মেরে ফেলে পালিয়ে যায়।

পরের দিন সকালেই থানা থেকে পুলিস-দারোগা এল। আমার ওপর সন্দেহ হল তাদের। কেন যে, ভগবান জানেন! আমার হাত ভালো ছিলো সড়কির। তা ছাড়া, বিয়ের দিন আমার সঙ্গে একটু কথা-কাটাকাটি হয়েছিল বরপক্ষের। পদ্মর বরকে আমি গালাগালিই দিয়ে ফেলেছিলাম, ডাক্তারবাবু। আর বাসরঘরে আমি গিয়েছিলাম ঠিকই—শেষ রাতেই—সে কিন্তু সৌদামিনীকে খুঁজতে।

অথচ পদ্ম বলল, আমি—আমিই নাকি বাসরঘর থেকে ডেকে নিয়ে গেছি তার বরকে।

আমি ছাড়াও আর দু'জনকে পুলিস ধরেছিল। তার মধ্যে একজন পদ্মদের পাশের বাড়ির জোয়ান ছেলে। অপরজন বরযত্রীদের এক ছোকরা। আইন-আদালত হলো, জেলে পড়ে পড়ে পচলাম। দোষী সাব্যস্ত হলাম আমি, আর সেই বরযাত্রীদের একজন নাম তার ধীরু।

আমার নামে অভিযোগ, খুনের ষড়যন্ত্রে আমার হাত ছিল।

বিচার জেল। ধীরুর ফাঁসিই হত, কিভাবে যেন রক্ষা পেল। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। আর, আমার শাস্তি আট বছর জেল।

কয়েদী হয়ে অনেক জেলে থেকেছি, ডাক্তারবাবু। পালাবার চেষ্টাও করেছি দু-দুবার। পারি নি।

চন্দ্রকান্ত এবার একটু থামল। বাইরে তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। অতল বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছি আমি। চন্দ্রকান্তর গলার তুলসীর মালাটায় বার বার নজর পড়ছে আমার।'

খানিক বিরামের অবসরে চন্দ্রকান্ত মনে মনে কথাগুলো বোধ হয় সাজিয়ে নিলো, বিশ্রামও নিল একটু। তারপর বলতে সুরু করলে আবার, 'ডাক্তারবাবু, জেলে পচছিলাম—কিন্তু মনে পড়েছিল সৌদামিনীর কাছে। ছটফট করতাম। চোখে ঘুম ছিল না, মনে অন্য কোন চিন্তা ছিল না; খালি ভাবতাম—পদ্ম আমায় সৌদামিনির কাছে জল্লাদেরও অধম করে দিয়ে গেছে। সৌদামিনী হয়তো বিশ্বাস করেছে পদ্মর ওপর আমার কু-নজর ছিল, পাপ ছিল মনে। অমন স্ত্রীর কাছে আমি পশু হয়ে থাকলাম। মাঝে মাঝে মনে হ'ত কোনরকমে যদি পালাতে পারি—প্রথমেই পদ্মকে খুঁজে বের করে গলা টিপে মারব।

সৌদামিনী ছাড়া আমার ভাবনা ছিল না—সৌদামিনীর মুখটা সারাক্ষণ যেন চোখের সামনে ভাসতো।

আমি আর পারছিলাম না। এমনিতেও মরতে বসেছিলাম। ঠিক করলাম—যা হবার হবে, আমি আর একবার চেষ্টা করব জেল থেকে পালাবার।

সত্যিকারের এক খুনে ছিল আমাদের সঙ্গে। সাঙ্ঘাতিক মানুষ সে। যেমন শরীর, তেমনি বুদ্ধি। সে আমায় শিখিয়ে পড়িয়ে দিল। জেলের বাইরে পালিয়ে কি করে চেহারা বদলাতে হবে—তাও ভাল করে শিখিয়ে দিলে। তারপর তার সাহায্যেই একদিন জেলের বাগানে কাজ করতে করতে পালালাম।

…সত্যিই পালালাম। কেউ আর ধরতে পারল না। পনেরো দিন গা ঢাকা দিয়ে মুখের চেহারাটা খানিকটা বদলে ফেললাম। এই যে দেখছেন গালে বিরাট দাগ, ছুরি দিয়ে চিরতে হয়েছে নিজেকে; তারপর ঘা না শুকনো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। আমার নাক ছিল চোখা। পাথরে নাক ঠুকে ঠুকে হাড় ভাঙতে হয়েছে। এমন যে কত কি করেছি তখন, কত বলবো আপনাকে।

…জেল থেকে পালাবার প্রায় দুই মাস পরে নিজের বাড়িতে ফিরে এলাম। তখন বর্ষাকাল। টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে। স্টেশনের পথে এক ভাঙা বাগানবাড়ী ছিল। সেই সাপখোপের বাড়ীটায় লুকিয়ে ছিলাম সারাদিন। রাত হতে নিজের বাড়ীর দিকে চললাম লুকিয়ে লুকিয়ে।

কতকালের চেনা জায়গায় ফিরছি তবু যেন পথ ঠাহর হয় না। কি ভয়! আর বলব কি, ডাক্তারবাবু, আনন্দও যেন টগবগিয়ে ফুটছিল আমার রক্তে।

সামনে দিয়ে যাবার উপায় নেই—পেছন দিয়ে ঘুরে একটা ডোবার পাশ দিয়ে গিয়ে মুখ বাড়ালাম। চাঁপাগাছের ডালের আড়ালে মুখ রেখে দেখলাম। জানালা খোলাই ছিল। সৌদামিনী আমার সেই সৌদামিনী, ডাক্তারবাবু! ওর গড়নে যেন আরও ঢল নেমেছে—রঙ হয়েছে আরও মাজা-ঘসা। ওর হাসি মুখই প্রথম দেখলাম আমি—প্রায় তিন বছর পরে!

প্রথমটা লক্ষ্য করি নি। গলার স্বর কানে যেতে লক্ষ্য করলাম সৌদামিনীই শুধু নয়, ও ঘরে জানলার দেওয়াল ঘেঁসে বসে আর একজন ছিল। সে পুরুষ। তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিলাম।

প্রথমটায় চমকে গিয়েছিলাম। পরে সৌদামিনীর কথাবার্তা শুনে আমি যেন আর আমার আনন্দ চেপে রাখতে পারছিলাম না।

লোকটা শয়তান। কুপ্রস্তাব এনেছিল। লোভ দেখাচ্ছিল সৌদামিনীকে। শাড়ি, গয়না, পাকাবাড়ীর লোভ। সৌদামিনী হাসছিল। আমি নিজের কানে শুনলাম, সৌদামিনী বলছে, 'আমার স্বামী রয়েছে গো, ভাসুর ঠাকুর—সিঁদুর পরি সিঁথিতে। বরং আর জন্মে তোমার গলায় মালা দেব।'

সেই লোকটা চলে গেল। যখন যায় তখন তাকে দেখলুম—পদ্মর ভাসুর।

শয়তান কোথাকার! আমার যেন দিশা ছিল না! মাথার ওপর বৃষ্টি ঝরে গেছে, চাঁপাগাছের ডাল থেকে ক'টা কাঠপিঁপড়ে ঘাড়ে-বুকে চলে এসেছে—কিছু খেয়াল ছিল না আমার। দেখছিলাম শুধু সৌদামিনীকে। তার রূপ, তার ভালোবাসাকে। সৌদামিনী আমায় তবে ভোলে নি। শুধু ভোলা নয়, স্বামীর সিঁদুর মাথায় নিয়ে আজও—এই বয়সেও—এমন সময়ও সে পরপুরুষের সঙ্গ চায় না। তার লোভ নেই। কয়েদী স্বামীই তার ভালো।

আবার যখন চেপে জল নামল, জানলা বন্ধ করতে এগিয়ে এল সৌদামিনী। বুক আমার ধুকধুক করে উঠল।

কাছাকাছি যখন এসেছে, তখন আস্তে করে ডাকলাম ওর নাম ধরে। এতকালের পর ডাক—সৌদামিনী চমকে উঠল, ভয় পেল।

চাঁপাগাছের আড়াল থেকে মুখ বের করে বললাম, 'সৌদামিনী—আমি—'

আমার মুখে আলো পড়ছিল না। তাছাড়া জেল-পালানো আসামী। তিন বছর আগেকার সে মুখ কি আছে আর! ওর আর দোষ কি?

—কে?

—আমি, শঙ্কর।

—তুমি! সৌদামিনী কাঁপছিল। সে আর্তনাদ করে উঠতে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার শাড়ি চেপে ধরলাম।

—আমি জেল পালিয়ে এসেছি। শুধু তোমার জন্যে। আলোটা এনে দেখ। আমি শঙ্কর।

সৌদামিনীর ভয় কাটল না। তবু ও লণ্ঠন এনে মুখ দেখল আমার।

বড় ভয় সৌদামিনীর। পাছে আমি ধরা পড়ে যাই। ও যে কি করবে, কোথায় আমায় লুকোবে, ঠাহর করতে পারছিল না।

আমি বললাম, 'চল আমরা তুজনেই এখান থেকে পালিয়ে যাই। এমন জায়গায় গিয়ে থাকব, কেউ চেনেনা যেখানে আমাদের।'

—সে কথা পরে। পালাবো বললেই কি পালানো যায়! কিন্তু তুমি আর এসো না। কে কখন দেখে ফেলবে।

—আসবো না তো বাঁচব কি করে?

সারারাত সেই জানলার কাছে জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাটল আমার। একটা গোটা রাতই কেমন করে যে কেটে গেল, বুঝতে পারলুম না।

দিনের বেলায় স্টেশনের পথে সেই ভাঙা বাগানবাড়িতে লুকিয়ে থাকি—আর রাত্রে লুকিয়ে চুপিসারে ডোবার পাশ দিয়ে বাড়ির পেছনে গিয়ে দাঁড়াই জানলায় মুখ দিয়ে।

পদ্মর ভাসুর দেখতাম, রোজ আসত। সৌদামিনীর কাছে তার সেই বদমাসটার কি কুকুরের মত হ্যাংলামি! সৌদামিনী বোধ হয় মজা পেতো টিটকিরি দিতে। 'কও কি, ভাসুর ঠাকুর! বোন দিলাম তোমাদের বাড়িতে। তার সিঁতুর মুছে দিলে—আমারও সিঁতুর মুছতে চাও!'

—তোমার স্বামী আর কি বেঁচে আছে?

—নেই? সৌদামিনী চোখ বড় বড় করত হাসি মুখেই।

—না, না। জেলখানায় কবে পচে হেজে শেষ।

জানলার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শরীরটা আমার কাঁপত রাগে। হাত দুটো নিস্‌পিস্‌ করত। ইচ্ছে হত ছুটে গিয়ে বদমাসটার গলার টুঁটি চেপে ধরি।

এমনি করে দিন পাঁচেক কাটল। রোজই অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়াই। সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে সমস্ত থেমে যায়—তখন সৌদামিনী জানলার কাছে এসে দাঁড়াই। কথা বলি চুপি চুপি আমরা।

আমি বলি, 'সৌদামিনী চলো, পালাই।'

—হ্যাঁ পালাবো। দাঁড়াও ব্যবস্থা করে নিই।

বোধ হয় এর পরের দিনই যথাস্থানে গিয়ে দেখি—জানলা বন্ধ। ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাত গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল। একটা কান্নার শব্দ শুনেছিলাম জানলায় কান দিয়ে। সৌদামিনীই বোধ হয় কাঁদছে। কেন, কিসের জন্যে কিছুই বুঝতে পারলাম না।

শেষ রাতে জানলায় মুখ দিয়ে আস্তে আস্তে ডাকলাম ওর নাম ধরে 'সৌদামিনী—সদু।'

কেউ সাড়া দিল না। খালি মনে হল, কে যেন ঘরের দরজার খিল খুলে বাইরে চলে গেল।

পরের দিন আবার গেলাম। সেদিনও জানলা বন্ধ ছিল প্রথমে। পরে খুলে গেল। ঘরের মধ্যে সৌদামিনী আর আমাদের এক দূর সম্পর্কের পিসি।

পিসি বলছিল, 'কলঙ্ক আর বাড়াস নি সদু। কিছুতেই আর কিছু হবার যোটি নেই। চোখ থাকে তো দেখিস নিজেই গতরখানা। গা ভেঙেছে, চিহ্ন ফুটেছে। কার চোখে ফাঁকি দিবি। তার চেয়ে—।'

পিসি যে কিসের কথা বললে, কোন কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। সৌদামিনীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলুম। সত্যি সারা গা ভেঙে তার রূপের ঢল নেমেছে। এমন চেহারা তো সৌদামিনীর ছিল না!

পিসি চলে যেতে পদ্মর সেই ভাসুর এল। সৌদামিনী তাকে দেখে প্রথমটায় একটু কেমন যেন হয়ে গেল। তারপর হেসে বলল, 'বাইরে বুঝি বৃষ্টি নেমেছে! জানলাটা বন্ধ করে দি। আমার আবার জ্বর-জ্বর গা।'

সৌদামিনী আমার মুখের কাছে এসে জানলার কপাটে হাত দিল। আমি যে এসেছি, সৌদামিনী কি জানে না? চাঁপাগাছের পাতার আড়াল দিয়ে মুখ বের করে রুদ্ধ স্বরে বলতে গেলাম—সৌদামিনী, আমি। কিন্তু তার আগেই সৌদামিনী জানলাটা বন্ধ করে দিয়েছে।

সারারাত জানলায় কান পেতে থাকলাম। সেদিন এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ে নি। আর কান পেতে থেকে কোনো কান্নার শব্দও শুনি নি।

পরের দিন আবার গেলাম। জানলা বন্ধ। চার পাশটাই কেমন যেন অন্ধকার—কোন সাড়া-শব্দ নেই। কারও গলার স্বর শুনলাম না। তবু অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মাঝরাত পর্যন্ত জানলায় কান পেতে থাকলুম। কেউ ঘরে ঢুকল না, কেউ বেরিয়ে গেল না বাইরে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল আবার। আমার কোন হুঁস ছিল না।

সাহস করে জানলায় টোকা দিলাম। একবার, দুবার, তিনবার। কোন শব্দ নেই। সাহস করে ডাকলাম ওর নাম ধরে। কেউ সাড়া দিল না।

রাত শেষ হয়ে এল। কেমন যেন লাগছিল আমার। এমন তো হয় না! হবার কথা নয়। বাড়ির সামনে দিয়ে ঢুকে দেখে আসবো—তার উপায়ও নেই। জেল পালানো কয়েদী। আমার রাস্তা পেছন দিয়ে—গাছ-গাছড়ার আড়ালে, ডোবা আর জঙ্গলের মধ্যে।

সকালের আলো ফুটতে হুঁশ হল। মশার কামড়ে সারা হাত-পা মুখ ফুলে উঠেছে। অসম্ভব জ্বালা সারা গায়ে। মনে। এতদিন মশার কামড় বুঝি নি, জানতেই পারি নি। সেদিনই প্রথম জানলুম।

এর পরও দুদিন গিয়েছি। কিন্তু জানলাই শুধু বন্ধ নয়, সে বাড়িতে একটা পায়ের শব্দও শুনি নি।

সৌদামিনী চলে গেছে। কোথায় গেছে, কার সঙ্গে, কেন—কিছুই বুঝতে পারলাম না। অমন সতী মেয়ে, নিজের চোখে কানেই তো দেখেছি, শুনেছি সব, ডাক্তারবাবু প্রথম দিন থেকেই—কি করে বিশ্বাস করব, বলুন।

চন্দ্রকান্ত থামল! আমি নির্বাক নিস্পন্দ। বাইরে তখন বৃষ্টি থেমেছে। গাছপালা স্তব্ধ। কখনো-সখনো একটা রাতপাখি ডেকে উঠছে।

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালাম চন্দ্রকান্তর দিকে। চন্দ্রকান্ত কড়িকাঠের অন্ধকারে চোখ রেখে হয়ত ভাবছে এমন সতী-লক্ষ্মী বউ তার—সেই বউ কোথায় গেল! কেন গেল!

ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে এল। আসলে চন্দ্রকান্ত সাপের ছোবল খেয়েছে—কিন্তু লোকটা এমন নির্বোধ, সে কথা কিছুতেই মানতে রাজি নয়। সাপের ছোবলকে মনে মনে আজও মশার কামড়ের লঘু ব্যথায় নামিয়ে নিতে চায়।

আমি উঠে পড়লাম। ওর এতকালের বিশ্বাসকে ভাঙতে ইচ্ছে হল না। বিষ যদি ওর মনে না ছড়িয়ে পড়ে থাকে, তবে নাই থাক—শুধু আশ্চর্য অবচেতন এক সুখ আর ব্যথা এবং অস্বস্তি নিয়ে চন্দ্রকান্ত তার স্ত্রী সৌদামিনীর কথা ভাবুক।

আমি চলে আসছিলাম। চন্দ্রকান্ত বলল, 'আমার আগের নাম ছিলো শঙ্কর আর বাড়ি ছিল·········'

—আগের চেয়ে এখনকার নামটাই তোমার ভালো, চন্দ্রকান্ত! আমি হেসে বললুম।